IBCA JAPAN

আগমনী

একাদশ সংস্করণ

AGOMONI

11th edition, 2023

INDIA (BENGAL) CULTURAL ASSOCIATION JAPAN

Paromita Roy

Agomoni 2023

By:

India (Bengal) Cultural Association Japan

Editing and Design:

Bhaskar Dasgupta, Sukanya Misra, Biplab Chakraborty, Pallab Sarkar, Subhasis Pramanik, Kaustav Bhattacharyya, Sovan Sen, and Subhabrata Mukherjee

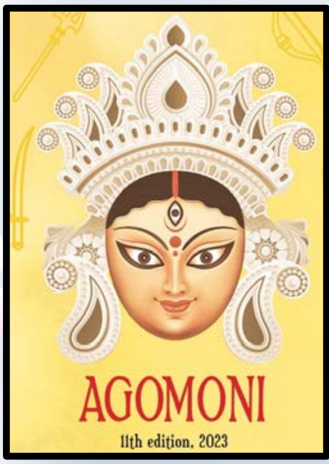

Front/Back Cover Page: Paramita Roy

Previous publications by IBCAJ:

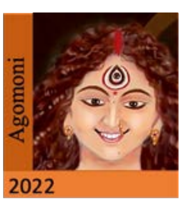

Agomoni 2021

Agomoni 2020

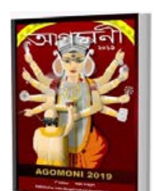

Agomoni 2019

Agomoni 2018

Saraswat 2018

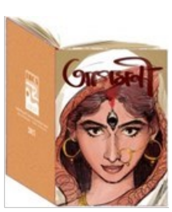

Agomoni 2017

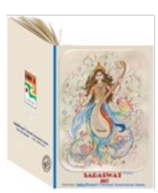

Saraswat 2017

Agomoni 2016

Saraswat 2016

Agomoni 2015

Saraswat 2015

Agomoni 2014

Saraswat 2014

Agomoni 2013

অনুষ্ঠান সূচী

পূজা : ১১টা ~
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান: ১২টা -১৩টা
প্রসাদ বিতরণ : ১৩টা - ১৪টা ৩০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৪টা ৩০ - ১৭টা
আরতি : ১৭টা - ১৮টা

Program

Puja: 11:00 onwards
Floral offering: 12.00 - 13.00
Lunch (Prasad offering): 13.00 - 14.30
Cultural Program: 14.30 – 17.00
Aarti: 17.00 – 18.00

Cultural Program Attractions:

- Dance Drama Chandalika
- Festive-medley from India
- In-house dance-song-drama ensemble
- IBCAJ kids band
- Games and many more

সবারে করি আহ্বান

Financial Statement of IBCAJ 2022 Durgapuja

DURGA PUJA 2022
Statement of Collection & Expenses

Income	Amount(JPY)	Expenditure	Amount(JPY)
Member & Guest Contributions	718,500	Hall Rent	93,849
Sponsors & Donations	164,303	Food	365,789
		Gifts & Raffle Draw prizes	18,726
		Puja Marketing & Other Rentals	26,400
		Transportation Charges	48,000
		Event Promotions	12,917
		Cultural Event related expenses	8,000
		Surplus	**309,122**
Total Income	**882,803**	**Grand Total**	**882,803**

_সম্পাদকীয়:_

দেখতে দেখতে দ্বাদশবছর অতিক্রান্ত। ২০১২ সালে দুর্গাপূজার থেকে শুরু করে গুটিগুটি পায়ে আজ আমাদের ১২ বছরে পর্দাপন। মাঝে আমরা পেরিয়ে এসেছি করোনা-কাল, অতিমারীর মারে পিছিয়ে না গিয়ে সম্মানের সাথে সেই ২ বছরে আমরা বাধাবিপত্তিকে দুরে সরিয়ে সবরকম অনুষ্ঠানই পালন করতে পেরেছি আমাদের সদস্যদের মনোবল ও কর্মতৎপরতায়। এখন করোনা অতীত, আমাদের অনাক্রমতার কাছে তা পরাজিত। এবং নতুন উদ্যমে আমরা আরেকবার স্বমহিমায় মাতৃবন্দনায় ব্রতী।

একথা অনস্বীকার্য দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। হিন্দুমতে দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। যদিও বাঙ্গালীর কাছে দুর্গার আরেকটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ হল দুর্গার শক্তিময়ী, অস্ত্রধারী ও জগদ্ধাত্রী দেবীরূপকে কন্যারূপে ও মাতৃরূপে কল্পনা করা। বাঙ্গালীর দুর্গা আটপৌরে, ঘরের মেয়ে, কৈলাসের শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'দিনের জন্য তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী বেড়াতে আসা। শক্তির প্রতীক দৈত্যজয়ী দেবীর এক কোমলমূর্তী রূপ, এক তুচ্ছতার জয়গান। ভয়ের পরিবর্তে স্নেহ ও ভক্তির মাধ্যমে তাঁকে উপাসনা – এটাই বাঙ্গালীর দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট। প্রকৃতীগতভাবে বাঙ্গালী মারমুখি স্বভাবের নয়, গঙ্গার বদ্বীপবাসী বাঙ্গালী পলিমাটির সহজাত উর্বরতার কারনে নম্র। অতএব দেবীদুর্গার মাতৃরূপ তুলনায় বাঙ্গালীর কাছে অনেকবেশি স্বীকার্য্য, তবে তাঁর শত্রুনাশক রূপ বিস্মৃত নয়, বরং তাও আরাধ্য এবং অনুপ্রেরণীয় – যখন দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' গানের মাধ্যমে দুর্গার আক্ষরিক অর্থবাহী রূপের উপাসনার কথা বলেন। যখন বাংলাতে প্রথম বারোয়ারী/সার্বজনীন পূজা শুরু হয় তা মূলত এই দুর্গার যুদ্ধংদেহীমূর্তীর পূজা যা পরবর্তীকালে সর্বজনীন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবের সূচনা করে। মা-এর এই দ্বৈতরূপই বাঙ্গালীর কাছে পরম পূজনীয়।

এতো গেল দুর্গাপূজার পূজাবিষয়ক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যা এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হল, সংস্কৃতি ও উন্মাদনা। দুর্গাপূজা নিয়ে বাঙ্গালীর উচ্ছাসের শেষ নেই। আশ্বিনমাস, কাশফুল, আকাশে পেঁজাতুলোর মত কিউমুলাস মেঘ, আর সেই সঙ্গে নতুন জামাকাপড় কেনার বা পাওয়ার – যাকে বিভুতিভূষনের ভাষায় বলে 'অনির্বচনীয় আনন্দ'। এক এক বেচাকেনার মরশুম বটে, যাক ঘিরে ছোটখাট ব্যবসাদারদের বছরকারের স্বপ্ন, ঢাকীদের একটু পয়সার মুখ দেখা, থিমপূজারআঙ্গীকে প্যান্ডাল বাধার শ্রমিকদের ও আর্টস্কুল থেকে সদ্যপাস করা উঠতি আর্টিস্টদের রোজগারের উপায় – সে এক দক্ষযজ্ঞ। আরও একটা জিনিস যা উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল শারদীয়া পূজাসংখ্যা। কিশোর বয়সের আনন্দমেলা, শুকতারা, কিশোরভারতী পেরিয়ে, পরবর্তীকালে দেশ, শারদীয়া পত্রিকা, বর্তমান, নবকল্লোল ও আরো কত শারদীয়া সংখ্যার এক অমোঘ আকর্ষণ।

শারদীয়া সংখ্যার অমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করা শৈশব বা কৈশোরে তো নয়ই, এখন কর্মসুত্রে জাপানবাসেও সম্ভব নয়। IBCAJ-র পুরোনো সদস্যরাও সুচনালগ্ন থেকে একটি শারদীয়া পত্রিকার আবশ্যিকতা বুঝতে পেরেছিলেন। IBCAJ-র দুর্গাপূজার তাই দ্বাদশে পা, আর সেই সঙ্গে আমাদের শারদীয়া 'আগমনী'-র এবার এগারো বছর। প্রতিবছরের মত এবারের ডালিতেও তাই নানারকম বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা হাজির – রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মনোজ্ঞ রচনা থেকে শুরু করে চন্দ্রযান-৩, অথবা ছোটদের দ্বারা লেখা গল্প বা আঁকা ছবি থেকে শুরু করে বড়দের জন্য ছোটগল্প। যদি কিছু ঘাটতি থাকে আশা করব আমাদের পাঠককূল সহৃদয় আনুকূল্যতার সাথে তা উপেক্ষা করবেন।

সম্পাদক হিসেবে এবছরের 'আগমনী'-র কিছু বিশেষত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরার লোভবর্জন করতে পারলাম না। প্রথমতঃ, এবছর একটি প্রচেষ্টা ছিল IBCAJ-র শিশুশিল্পীদের আরো বেশি করে অনান্য লেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা, যার জন্যে ছোটগল্পের অনুষঙ্গী ছবির জন্য আমরা শিশুশিল্পীদের আঁকা ছবি ব্যবহার করার সীদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য যে এই সৃজনশীল প্রকল্পে বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের জন্য আমরা শিশুশিল্পীদের আঁকা ছবি ব্যবহার করতে পেরেছি। আরেকটি বিষয় হল বারো বছর উপলক্ষে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দুর্গাপূজা আয়োজক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম যাতে IBCAJ-র সাথে অন্যান্য দেশের প্রবাসী বাঙ্গালী সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের ভিত আরো গভীর হয়, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি সংস্থা এই শারদীয়া পত্রিকায় লেখা পাঠিয়েছেন। গতবছরের মত এবারেও আমাদের মায়ের হাতে মায়ের পূজা, অর্থাৎ মহিলা পৌরহিত্যে আমাদের দুর্গাপূজা সম্পন্ন হবে। প্রসঙ্গত, মহিলা পৌরহিত্যে দুর্গাপূজা গোটা ভারতবর্ষে এক নতুন পদক্ষেপ, যা ২০২১ সালে কলকাতার ৬৬ পল্লী সংগঠনের হাত ধরে শুরু। পরের বছর ২০২২ সাল থেকে IBCAJ-এও সেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করে। সর্বশেষে জানাই এবছর আমাদের পূজা হবে নতুন প্রতীমাতে, তা কার্যকর করার পিছনে IBCAJ-র সকল সদস্যদের দলগত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

পাঠককূলের প্রতি আমাদের নিবেদন, শারদীয়া আগমনী ২০২৩ আপনারা পড়ুন, আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের কাছে তা পরিচয় করিয়ে দিন, কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলে মার্জনা করবেন ও সরাসরি আমাদের জানাবেন। দেখা হবে মন্ডপে - অঞ্জলী দিতে গিয়ে, ধুনুচি নাচতে গিয়ে, আড্ডা দিতে গিয়ে, একসাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাততালি দিতে গিয়ে।

ধন্যবাদান্তে,

সম্পাদক,আগমনী, ২০২৩

भारत के राजदूत
AMBASSADOR OF INDIA

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku
Tokyo 102 0074

MESSAGE

It gives me immense pleasure to extend my congratulatons to the India (Bengal) Cultural Association in Japan (IBCAJ) which is organizing the Durga Puja in Tokyo on 22 & 23 October 2023.

2. I am happy to note that IBCAJ has been organizing the Durga Puja celebrations to carry forward our Indian traditions and values. The celebrations also provide a wonderful occasion to our Japanese friends to enjoy culture of India, and thus promotes mutual understanding and friendship leading to strengthening of P2P pillar of India-Japan Special Strategic & Global Partnership.

3. As you are aware, Embassy of India Tokyo has been celebrating all festivals of India as part of our efforts to connect our Japanese friends more closely with India and our cultural values and ethos. I invite the Indian diaspora to join hands with the Embassy to further deepen our cultural engagement with Japan and celebrate India i.e., Bharat in Japan together with our Japanese friends.

4. I would also to congratulate IBCAJ for bringing out their annual literary e-magazine "*Agomoni*", which is a wonderful platform for literary expressions from the community.

5. On this auspicious occasion, I convey my best wishes to my fellow Indians and Japanese friends for their good health, prosperity and happiness.

(Sibi George)

Tokyo
September 14, 2023

Telephone: +81-3-3265-5036 : Fax: +81-3-3262-2301 : E-mail: amb.tokyo@mea.gov.in : amboffice.tokyo@mea.gov.in

IBCA JAPAN

From the President's Desk

Another year has just passed by, and it is the time to celebrate Bengalis' biggest festival *Durga Puja*. We are really proud to be able to continue celebrating this festival for a straight 12 years in one of the busiest cities in the world. This was possible only because of the collective strength of our members, their co-operations and absolute dedication toward IBCAJ.

This year is our twelfth year of Durga Puja as we started back in 2012. *Agomoni* started publishing from the following year 2013. So, this is the 11th year of *Agomoni*.

We are privileged to celebrate our 12th year in a very important juncture where just in 2021 Kolkata Durga Puja has been registered as Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. This is a proud moment for all of us and I feel extremely happy to share this news with everyone.

All of us spent possibly one of the darkest phases of our life in the past three years during the pandemic. When I started penning down a similar message for *Agomoni* back in 2020, I had an unknown fear and a great uncertainty about overcoming this adversity. The end of the tunnel was not visible and I, personally, was not sure by when we would be able to organize Durgapuja in full scale again. For the past three years, we have had to follow various covid protocols and despite our reluctance, we could not allow large number of guests to join the Puja. We had to scale down the celebration considerably and abide many rules and regulations. Nevertheless, we all unitedly worked to continue the traditions and observe the rituals.

It gives me immense pleasure to note that those dark days are finally behind us. With the blessings of Maa Durga nothing severe happened to our members and their immediate family members during the pandemic. Further, this year, we are able to organize Durga Puja again in full scale and without any restrictions. This have been possible only for our members. I would like to take this opportunity to thank our magazine team and the cultural team for their tireless work for the last three months. I would also like to thank our social media team for helping IBCAJ to reach out to the maximum possible people in Japan both from Indian as well as Japanese diaspora. It was impossible without their help in this new age of information technology.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to The Embassy of India in Japan for their constant support and guidance. The year 2023 marks the India-Japan year of tourism with the theme Connecting Himalayas with Mount Fuji. We are extremely happy and proud to be part of this initiative. I sincerely hope that through this and other similar initiatives in the future, Indo-Japan relationship will reach a new height and cross new milestones.

I would also like to thank all of our sponsors for their continuous support and holding our hands throughout in this journey.

Last but not the least, on this auspicious occasion, let us forget our pains, sorrows, pride and arrogance and come closer to create a bond of unity and integrity. Let us pray to Ma Durga for our good health and prosperity for the coming days.

HAPPY DURGA PUJA to all of you.

Date: 22 October 2023
Swapan Kumar Biswas
Place: Tokyo,
(President, IBCAJ)

সূচীপত্র

বিশেষ আকর্ষণ

বিদেশের বারো-ইয়ারী — 10-16
অকল্যান্ড, অসলো, কুয়ালালামপুর, লাগোস, ক্রাকো, গ্রেটার অ্যাটলান্টা,
লুটন, সিঙ্গাপুর, টরন্টো, স্টুটগার্ট, বোগোটা ও তোকিয়

বিশেষ প্রবন্ধ

ইবারাকির ইজুরায় কবিগুরু
প্রবীর বিকাশ সরকার — 18-20

পাঠ প্রতিক্রিয়া- নরওয়েজিয়ান উড
আলমগীর হোসেন বৈদ্য — 22-23

প্রতিবাদের ময়দানে
শুভব্রত মুখার্জী — 24-26

"বিশ্বকাপের" গল্প
সুদীপ্ত সাহা — 27-28

দুর্গা পূজার ইতিকথা
সুপ্রিয় সেনগুপ্ত (কারিগরী কবিয়াল) — 29

「日本の伝統的な「花祭り」についての体験－外国人の視点から－」
Dr. Hiya MUKHERJEE （ムカルジー ヒヤ） — 30-31

Ikebana in my life
Mahasweta Laskar — 32-33

এক নতুন পৃথিবী
অনুরাগ ঘোষ — 39

মা দুর্গা ও নব রাত্রির আধ্যাত্মিক রহস্য এবং আমাদের মধ্যে দিব্যতার উন্মোচন
পিন্টু বাগ — 73-74

গল্প / রম্যরচনা

নুলিয়া
অর্চিস্মিতা মিশ্রা — 44-45

The Ujaan Majumder
Haunted Hotel — 52

অনুরণন
সুরজিৎ প্রামাণিক — 57-59

আলমারিতে
কেয়া ভট্টাচার্য্য — 60

লোডশেডিং
উদয় চক্রবর্ত্তী — 61-62

হাজারীবাগের আষাঢ়ে গল্প
মধুমিতা নাগ ঘোষ — 47-49

টেলিফোন
রীনা রায় — 54

যুক্তির ওপারে
এণাক্ষী মিশ্র — 55-56

দূরভাষ
সৌম্য দাশগুপ্ত — 63-66

বদল রহস্য ও রঞ্জুদার হার
ভাস্কর দাশগুপ্ত — 67-68

বাক্স বদল
পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী — 69-72

কবিতা

কবিতাগুচ্ছ
অর্ঘ্য দীপ, শৌভিক সেন, সুচিহ্নিত — 23
শুভজীৎ মুখার্জী — 31
সুছন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, অঞ্জন বর্মন, সৈকত ঘোষ , শৌভিক সর্দার, Dr Sudipto Banerjee,
সুকন্যা মিশ্র, সুলতানা পারভীন, — 34-38
প্রত্যূষা সরকার — 41-42
Khusi Verma — 53

সূচীপত্র

চিত্রগুচ্ছ

ধ্রুপদ চ্যাটার্জী (26,66), আহিরী মজুমদার (26,34), অগ্নীমিত্রা সাহা (37), দেবরাজ বিশ্বাস (45), দেবস্মিতা বিশ্বাস (48),
Sambhavi Solanki (52), মৌমিতা বিশ্বাস (60), আরন সেন (61)

Soma Halder (28), মৌমিতা রায়চৌধুরী (31,40), শুভঙ্কর রায় (33,40), চিত্রাঙ্গদা কুন্ডু (35,36),
Dr Sudipto Banerjee (37), অনির্বান নন্দী (38), সুকন্যা মিশ্র (38), *অর্পিতা দাশগুপ্ত (39),*
শাশ্বত রায় (39, 68, 72)

Recipe section

দই ভিন্ডি, মাটন গোয়ালন্দি স্টিমার কারি - মৌসুমি বিশ্বাস 75

ORYXPEER

ELEVATING BUSINESSES EMPOWERING PEOPLE

Oryxpeer inc
オリックスピアー株式会社

WE ARE HIRING THE FOLLOWING POSITIONS AND MORE

SAP MNP (Tokyo)
SAP MM/EWM
SAP EWM (Tokyo/Other location)
SAP SD (Tokyo)
SAP Project Manager (Tokyo)
E-commerce (Tokyo)
D365 F&O (Tokyo)
Automotive Electronics Engineer (Tokyo/Other location)
Automotive Mechanical Engineer (Tokyo/Other location)

SEND YOUR CV TO INFO@ORYXPEER.COM

VISIT US
oryxpeer.com

ADDRESS
4-1 Kioi-Cho, BC 2715 Hotel New Otani, Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0094
102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4-1-2715 ビズネスコートホテルニューオータニ

বিদেশের বারো-ইয়ারি

অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড

গগনচুম্বী স্কাই টাওয়ার হোক বা অধুনা সুসুপ্ত রাংগীটোটো আগ্নেয়গিরির পৃষ্ঠভুমি, গম্ভীর ও শান্ত সমুদ্র সৈকত হোক বা আঙ্গুরের বাগান, এই শহর ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের এক অদ্ভুত নিদর্শন। আপনি প্রকৃতিপ্রেমী হোন বা ঐতিহাসিক, অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী হোন বা খাদ্যপ্রেমিক, অকল্যান্ড অবশ্যই টানবে অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা আপনাকে আরও বেশি কিছু পাওয়ার জন্য আবেগ আনতে বাধ্য।

সাদা মেঘের দেশের বানিজ্যিক রাজধানী, আমাদের প্রাণবন্ত এই শহর অকল্যান্ড এর প্রবাসীর দুর্গাপুজোতে, সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপে অবস্থিত, অকল্যান্ড এমন একটি শহর যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে তার শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মহাজাগতিক অনুভূতি দিয়ে। প্রবাসীর দুর্গাপুজোয় মুল আকর্ষণ অবশ্যই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তার বৈচিত্র্য যার আয়োজন করা হয়েছে অক্টোবরের ২০-২৩। এ বছর পুজোর সাজের থিম সত্যজিৎ রায়। ২০২৩ সালের ২০শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যায়, অকালবোধন দুর্গাপুজোর জন্য "আগমনী" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করা হবে। শনিবার সত্যজিৎ রায়ের বৃত্তাংশ থাকবে এবং লোকনৃত্য থাকবে। (এক ঘন্টার অনুষ্ঠান)। রবিবার সকালে আমরা আয়োজন করেছি শিশুদের "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার, আর সন্ধ্যায় থাকছে রবিবার বলিউড ডান্স আর ছায়া ছবির গান । দশমী পূজার পর সোমবার সকালে, প্রবাসী ও ভগিনী সংস্থাদের দ্বারা আয়োজিত হবে "ধুনুচি নাচ", যা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির অভিন্ন এক অঙ্গ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেকে বহন করার প্রতিশ্রুতির সংগে সংগে ব্যক্তিগত প্রতিভা বা নৈপুন্যকে তুলে ধরার, সবাইকে আনন্দ দেওয়া ও নিজে উপভোগ করার এ এক অনন্য সুযোগ। যেদিকেই তাকান, দেখতে পাবেন ধুতি বা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত মার্জিত পুরুষদের, আবার মহিলাদের সাজসজ্জাতেও ধরা পরে বৈচিত্র্য ও চমক, তা রকমারি গয়নাতেই হোক বা প্রাণবন্ত সব রঙের বাহারী শাড়িতে এবং অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন ভাবে সুসজ্জিত হওয়ার মুনশিয়ানাতেও। প্রতিবছর প্রবাসে থেকেও আমাদের এই দুর্গাপূজা উত্তরত্তর আরও বিবিধতা বা বৈচিত্র্য পেয়েছে।

সাত সমুদ্র পারে সাদা মেঘের এই দেশে আমাদের 'প্রবাসী'র এই দুর্গাপূজার একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো পূর্ববর্তি প্রজন্ম, বর্তমান প্রজন্ম এ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয়। এই সমন্বয় পুজো আয়োজনের প্রত্যেকটি পর্যায়তেই দেখা যায়। আমাদের পুজোর পৌরহিত্য শুরু থেকেই নিয়মিত করেন অকল্যান্ডের অধুনা সেবানিবৃত্ত প্রফেসর দেবেশ বাবু।

আপনি কি প্রবাসীর ৩২ তম দুর্গাপুজো উদযাপনে যোগ দিতে প্রস্তুত? তা হলে কোমর বেঁধে নেমে পরার প্রস্তুতি নিন একটি অসাধারণ জমজমাট পুজো উদযাপনের জন্য। বসন্তের হাওয়া শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়ার সাথে আবেগ, উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার অনুভূতিও এটি বহন করে ।

https://www.probasee.org.nz/

অসলো, নরওয়ে

নিশীথ সূর্যের দেশের রাজধানী অসলো শহরে ২০০৯ সালে প্রথম কুমারটুলি থেকে মূর্তি এনে "অসলো দুর্গাপূজা" আয়োজিত হয়। বেশ কয়েক বছর এই আয়োজন পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। অসলো শহরে দুর্গাপূজা করা সহজ ছিল না শুরুতে এবং দেশটিতে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ থাকায় আদৌ কিছু করা যাবে কিনা এবং পূজার আচারগুলি কিভাবে পালন করা হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। অথচ কালক্রমে আজ যুগোত্তীর্ণ এই পূজা কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে অসলো শহরের রুচিশীল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান বাঙালিদ্বারা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের দুই বা তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এমনকি, এই পূজার প্রচার দিল্লিতে থাকা নরওয়েজিয়ানদূতাবাস স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সামাজিক মাধ্যমে করে ভারত-নরওয়ে সম্পর্কের উন্নতি নিদর্শনের ছাপ রাখে। সারাবছরব্যাপী পরিকল্পনাদ্বারা এই পূজার সংগঠকরা পূজার অর্ঘ্য এবং উপাচারের আয়োজন করেন। আধুনিক বছরগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যাদির আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষয়টি সহজতর হয়েছে। আগামী ২০-২২ শে অক্টোবর ফুরুসেত ভেল্হুস-এ এই পূজার অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীনরূপে সুসম্পন্ন করার প্রস্তুতি চলেছে।

নলিনাভ সেনগুপ্ত

https://www.oslopuja.com

Kuala Lampur, Malaysia, *covered by Susmita Majumdar (Kolkata)*

"Some memories remain etched in our mind that gives us pleasure whenever we reminisce. My son Aveek and his family are residents of Kuala Lumpur, Malaysia. We had heard exciting stories of Malaysian Bengali Association (MBA) organized puja and we were eager to participate in it.

In 2019 we had a unique opportunity of experiencing an overseas Puja festival. Initially we were a bit apprehensive, being strangers and senior citizens, how the group would accept and integrate us among their midst. To our utter surprise we found that overseas Bengalis are inclined to the Bengali Customs more than the residents of Bengal.

They received us wholeheartedly without any inhibition. Our participation started with their "Ananda Mela" function; an array of Bengali Cuisine prepared by most of the families.

We took active part and prepared Paratha, Ghugni and Paneer roll with active participation from Sohini and our daughter Atreyi (she came all the way from Sydney Australia to be a part of the festival). The items were consumed like hot cakes. We took food from other counters as our family was relieved from cooking dinner.

Next day Puja started with great devotion and all the rituals were followed with respect and seriousness.The organizing body planned each event so meticulously that the events were absolutely hassle free.

An astounding experience: we saw the ladies group cooking "Mayer Bhog" themselves for offering to the Goddess Durga.

This practice was continued for all four days of the festival. All members, guests and their family joined in the community lunch and dinner where 300 members participated.

Another unique feature: senior citizens were allocated separate table for lunch and dinner where they were served by their volunteers. This shows their concern and respect towards their seniors.

The evenings were assigned for cultural programme where members show cased their talents. New generation kids speaking broken Bengalee also participated wholeheartedly to show respect towards their roots. Our son's family – Aveek, Sohini and Mirra took part in several programs. The programs were of high quality but we sensed that real objectives of such events were to foster goodwill and brotherhood among the members.

"Kumari Puja" was performed where young daughters of members were dressed like Goddesses and were offered puja to them.

Purohit was flown from Kolkata who was very happy with the organisers' devotion and hospitality.

On Bijaya Dasami day there was a grand feast which marked the concluding event of the function. We happen to participate in overseas Durga Puja in US and Singapore, but Malaysian Bengalee Association's Puja made a deep mark in our mind for their spontaneity and simplicity of the whole arrangement."

https://mba.org.my/

Lagos, Nigeria

Lagos is economical capital of Nigeria. Weather is like Mumbai. 3rd mainland bridge is connecting the big city. Here many Indians are doing business for last 150 years. As the country has huge economical importance in Africa so various MNC s are also doing business here. The country is 7th largest oil producer in world. To support and run the economy many Indians are working here in different roles. You will find Indians almost in various organizations. So many Bengalis are here also for the same reason. Different state has their own state organizations to promote their culture and festivals here to the newcomer. Similarly we created our own Bengali organization called Lagos Bangiyo Parishad. As need of professional people are not staying permanently here like USA or UK, so our members varies from 150 to 200 in Lagos every year .In the year of 1980 our people started Durga pujo in small way with pictures of Ma Durga. We used to shift our venues. From 2004 we fixed our venue in Hotel new Castle. We Brought idol in 2007 and changed in 2017 and again changing this year. During pujo days we celebrate for all five days from sasthi to vijaya Dashami as per thithi. We also organized different cultural programs to promote Bengali culture and teach our young generation about our heritage. Many Indians are joining with us during pujo.

We distribute our foods to all devotees during pujo days.

https://www.facebook.com/LagosBongiyoParishad

Krakow, Poland

As the President of the Krakow Bengalis' Association, it gives me immense pleasure to extend my warmest congratulations to the Indian Bengali Cultural Association of Japan on their 12th anniversary of Durga Puja celebrations. This grand occasion not only marks a milestone for the association but also highlights the cultural unity and diversity of the Bengali community in Japan.

The publication of their annual magazine, Agomoni,

during the Durga Puja celebrations, adds another layer of excitement and joy to this already jubilant occasion.
The Krakow Bengalis’ Association is also gearing up to celebrate its 3rd Durga Puja, marking another significant milestone in their journey to promote and preserve Bengali culture in the heart of Poland. This vibrant association, established with the aim of bringing together Bengalis residing in Krakow, has been instrumental in fostering a sense of community and celebrating the rich traditions of Durga Puja.
One of the highlights of the event will be the cultural program, showcasing the diverse talents of the Bengali community in Krakow. This platform not only allows the community members to showcase their talents but also serves as an opportunity for the locals to experience and appreciate the richness of Bengali traditions.
The Krakow Bengalis' Association has always been committed to inclusivity and open to embracing individuals from all walks of life. They believe that cultural celebration goes beyond boundaries and are thrilled to witness the growing interest and participation from the local Polish community in all festivities. It is heartening to witness the exchange of cultures and the building of bridges between different communities, fostering understanding and promoting harmony.
The association's dedication to preserving Bengali culture extends beyond the festive season. We organize regular cultural events, workshops, and language days, providing a platform for Bengalis in Krakow to connect with their roots and pass on their traditions to the younger generation. This commitment to cultural preservation ensures that the legacy of Bengali heritage remains alive and thriving in the heart of Poland.
Durga Puja celebrations are a testament to the power of community, the richness of tradition, and the spirit of unity. Let us join hands in celebrating this joyous occasion and embracing the cultural tapestry that makes our world a more beautiful place.

Shubho Durga Puja!

https://kbapoland.com/

Greater Atlanta, USA

The Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) was established in 1979 by our founding members, many of whom are no longer with us. The association was founded to bring together the Bengali community and celebrate Durga Puja far away from home. Currently, we have almost 250 member families.

We have been organizing Durga puja for 43 years. As an association, our primary purpose is to promote our diversity of rich bengali cultural heritage through charitable, educational, and literary activities.

Our calendar of events and activities includes Saraswati Puja, Mahalaya, Durga Puja, Lakshmi Puja, Kali Puja religious festivities, and a yearly Picnic. The main challenges we face in our activities are the customary issues of a fast-growing organization. The organization grew to the largest one in the southeastern United States. Our Pujas are attended by many of our friends from neighboring states.

The highlight of our Durga Puja celebrations is the wholesome ambiance and inimitable flavor of the Puja festivities (cultural programs/ community engagement/ food festival/dhunuchi nrityo/ Shankho bajano protijogita, etc.).

Our message for our new friends in Tokyo is to have a vision for future growth and something for everyone, which becomes more and more essential as the organization grows. There is something appropriate for our seniors, younger boys, and girls, and even for our kids, to provide each of them the feeling of belonging to the organization with the rich cultural heritage of Bengal.
https://www.baga.net/

Luton, UK

The Luton Bengali Cultural Association was established in 1996 by our founding Secretary Shyamal Kanti Roy. The association was founded to bring together the Bengali community and celebrate Durga Puja far away from home. Currently, we have 15 members.

We have been organizing Durga Puja since 2017. As an association, our main purpose is to bring together the extended Bengali/Indian community and celebrate our auspicious occasions. This event also provides an opportunity to expose our children and future generations to our rich culture and traditions. Our calendar of events and activities include organizing Durga Puja and Saraswati Puja.

The highlight of our Durga Puja celebrations includes Cultural Performances by the members and kids, Aarati, Sindoor Khela and Dhamail and Bijoya Sanmilami. Our message for our new friends in Tokyo is by celebrating Durga Puja and experiencing the vibrant culture and traditions of Bengal and India you foster unity and harmony among diverse communities. Also, it is an opportunity to show case our rich traditions to the local Japanese community.

https://www.facebook.com/lutondurgapuja

Singapore, Singapore

As the President of the **Bengali Association Singapore**, I am delighted to express my deepest regards and congratulations to the Indian Bengali Cultural Association of Japan on their 12th anniversary of Durga Puja celebrations. It is heartening to see the spread of Bengali culture & traditions in Japan through the Association.

Durga Puja has been celebrated in Singapore since the establishment of BAS in 1956. Since its inception in 1956, the Bengali Association Singapore (BAS) has played a pivotal role in preserving and promoting Bengali culture within Singapore. Originally comprising 50 families, the association has grown exponentially, currently boasting over 1,000 member families. BAS organizes a diverse array of events throughout the year, including the celebration of significant Bengali festivals like Durga Puja, Bengali theatre, Annual Shanksritik Shondhya, Bengali New Year, and Rabindra Jayanti.

Over the years, BAS has fostered a close relationship with the team at the Ministry of Culture, Community, and Youth (MCCY). Collaborating on numerous initiatives, BAS's efforts have garnered appreciation from MCCY.

'Sharodiya r Subechha & Abhinandan' to all members of Indian Bengali Cultural Association of Japan!

Dr. Sowmya Mitra
https://www.bas.sg/

টরন্টো, কানাডা

দেবী দুর্গার সঙ্গে, ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ,বাঙালি সত্তা এবং ঠিক সে কারণেই বাঙালির যেখানেই অবস্থান, সেখানেই গড়ে ওঠে, দুর্গাপুজো ঘিরে উত্তেজনা ও তার উপাসনা. টরোন্টোর বাঙালিরা এর ব্যতিক্রম নয়।

২০১১ সালে বেশ কিছু মানুষ স্থির করেন, টরন্টো এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বুকে, কলকাতার পাড়ার পুজোর আমেজ তৈরী করলে কেমন হয়? সেই রকম প্যান্ডেল তৈরী করা, কলকাতার আড্ডা, খাওয়া, এবং তার সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতিকে মেলে ধরা, নতুন প্রজন্মের কাছে, যারা বড় হচ্ছে বিদেশের মাটিতে।

ব্যাস, বাঙালিকে কি আর আটকে রাখা যায়? যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। টরোন্টোর বুকে গড়ে ওঠে "আমার পুজো" প্রতিষ্ঠান. সেই প্রতিষ্ঠান আজ এই ২০২৩-এ এসে হয়ে উঠেছে দুর্গাপূজার প্রতীক, টরন্টো শহরে।

দুদিন ব্যাপী উদযাপিত হয় এই উৎসব। দক্ষিনেশ্বর এর মন্দির থেকে, বিশ্ববাংলা গেট, পুরান থেকে বাংলার কুড়ে ঘর, ট্রাডিশনাল থেকে কনটেম্পোরারি সাজ, সব রকম প্যান্ডেল তৈরী করা হয় এক এক বছর। পুজো মানেই বাঙালির পেটপুজো। মেনুতে চপ, কাটলেট থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, মটন, কোর্মা, কালিয়া কিছুই বাদ পড়েনা।

তবে সব থেকে জনপ্রিয় এই পুজো যে কারণে সর্বাধিক লোকের মন জয় করতে সক্ষম হয় সেটি হলো "আমার পুজোর" বিনোদন। সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, শিশুদের অনুষ্ঠান, সর্বোপরি কলকাতা বা ভারতবর্ষ থেকে আসা কোনো স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী এসে আপামর জনতাকে আনন্দের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যান।

এখানেই থেমে নেই "আমার পুজো"। বাঙালির সাহিত্য প্রেম ও সৃজনশীলতাকে বজায় রাখতে, শুরু করা হয় একটি ই-ম্যাগাজিন, "আমার পত্রিকা"। "আমার পুজো" উদ্বুদ্ধ করে কবিতা, গল্প, ছবি আঁকা। "আমার পুজো" আরো অনেক স্থানীয় উন্নয়ন মূলক কাজে নিযুক্ত।

সকল জগত-বাসীকে কে দুর্গা পুজোর শারদীয় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় " আমার পুজো"।

https://www.apcatweb.com/

Stuttgart, Germany

In 1995 this festival of Durga Puja was started in the South German city of Stuttgart by Mr Tushar Kanti Ganguly and his friends. Stuttgart is the headquarters of Mercedes and Porsche. Today this is the oldest Puja in South Germany and is being continued by his son Timir Kanti Ganguly and his friends. Popularly known

as "Ganguly barir Puja" as it is tries to create the atmosphere of a homely Durga Puja unlike the more commercial ones. Bengalis and Indians who like the "ghoroa"(homely) type of the Puja come to attend this annual ritual which is celebrated for 5 days around this time of the year. The Ganguly puja maintains the Puja ritual timings like the same in India. This year the priest is coming from Frankfurt to officiate. Cultural activities are also performed by local artists and also a Bengali street food festival is planned this year.

For further information about the Puja visit the website at www.ganguly.de/durgapuja

Bogota, Columbia

Durga Pooja is one of the main festival in India particularly for eastern part of India. The unification of Goddess Durga ties all Indians in a cohesive bond across the planet. It is jointly celebrated with Navaratras which is most popular in the Northern and Western part of India.

Durga pooja's essence is to commemorate the victory of good over evil and divine feminist. It begins with the welcome of Goddess as Mahalaya and ends with Vijaya Dashami. To fight off the demon king, Mahishashura, all gods came together to worship Adi Shakti and what emerged out was Goddess Durga who killed the demon on the 10th day of fight. Durga Puja is celebrated with much pomp among all Bengalis from Indian community across the globe.

"Daandiya" is a very popular dance form that is observed during these nine days of celebration, where men and women dance with colorful sticks on music beats that is said to be a recreation of battle between the Devi and demon.

Colombia is primarily a Catholic country however, Colombia has embraced Durga Puja as their own festival and equally love and respect our Indian tradition and customs. They perform and participate with us with the same enthusiasm in all the cultural activities that takes place during the time.

Durga pooja is a festival that brings people together. Durga pooja is organized every year to celebrate one out of many Indian Culture in Colombia. Durga Pooja celebration in Bogota, Colombia had started in 2015 and this will be the 9th year of the celebration in Bogota.

The event runs purely on donations and different people serve voluntarily. During the pandemic, we organized Durga pooja on a smaller scale.

The Indian Community at Bogota served more than 400 lunches to express our gratitude to the first-line Doctors, nurses, and medical staff for their tireless efforts to fight against Covid 19. We also donated to the Mission of Charity. In 2019, Durga Pooja, Bogota got 10th position among Durga Pooja held worldwide.

Durga Pooja 2023 will be organized on a magnificent scale with various activities including both Colombian and Indian cultural performances being a major attraction. Government officials from both countries have been invited to grace this auspicious occasion. Please visit our page for more information.

https://www.facebook.com/BogotaDurgaPuja

তোকিয়ো, জাপান

জাপানের সাথে বাঙালিদের যোগাযোগ নতুন নয়, এ যোগাযোগ ঠিক কতটা পুরোনো সে সবের সরেজমিন করা গবেষকদের কাজ। কিন্তু আম বাঙালির কাছে কয়েকটা উদাহরণ অন্তত হাতের সামনেই মজুত। এই ধরুন রবীন্দ্রনাথের জাপানযাত্রা বা রাসবিহারী বসু ও নেতাজির সাথে জাপানের নিবিড় যোগাযোগ, এসব জানার জন্য আমাদের সত্যিই কোনো গবেষণার দরকার নেই। বরং একসময় স্কুলের গন্ডি পেরোনোর আগেই এসব তথ্য সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম । সেই বহমান ধারাকে বজায় রেখে গত কয়েক দশক ধরেই বাঙালি প্রাণের আনাগোনা এদেশে। অবলীলাক্রমে বহুবিচিত্র খাদ্যাভ্যাস আর দুর্ভেদ্য ভাষার প্রাচীর কে জয় করে বহু বাঙালি থেকেও গেছে এখানে বহু বছর। তাদের হাত ধরেই জন্ম নিয়েছে অজস্র সম্ভাবনা। আর সেই অসংখ্য সম্ভাবনাকে বাস্তব করে আরো পাঁচটা সংগঠনের মতো জন্ম নেয় IBCAJ। পথ চলার শুরু বিদ্যার দেবীর বন্দনা দিয়ে, তারপর একে একে মা উমা র গৃহে আমন্ত্রণ থেকে শুরু করে বাংলা নববর্ষ উদযাপন, বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী সবই একের পর এক পালিত হয়ে আসছে। ২০১২ সাল থেকে শুরু করে মহিষাসুরমর্দিনী মা দূর্গার আবাহনের ১২ বছর পূর্তি এ বছর। সেই শুরুর দিনগুলো থেকেই IBCAJ র দূর্গাপুজো পৌঁছে যেতে চেয়েছে অনেক অনেক বেশি মানুষের কাছে, উদ্দেশ্য একটাই শুভ শারদীয়ার চিরকালীন ঐতিহ্য কে বজায় রেখে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের আনন্দ উৎসবের উৎস হয়ে ওঠা। সেই উদ্দীপনার রেশ শুধুমাত্র বাঙালিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর ভারতকে পাশে নিয়ে আজ IBCAJ র পুজো ছুঁয়ে গেছে জাপানি সমাজেও। এ উৎসব আজ আক্ষরিক অর্থেই যুগউত্তীর্ণ। কৈশোরের পথে পা দিতে চলা এ উৎসবের আনন্দকে আরো খানিকটা ছড়িয়ে দিতেই এবারের দেবী আরাধনার আয়োজন দুদিনব্যাপী। ২২ আর ২৩ এ অক্টোবর। সাথে প্রতিবারের মতোই থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজনদের অভ্যর্থনা।

আমাদের আশা এবারের উৎসবকে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো আরো বৃহত্তর সমাজের কাছে, দেশ, ভাষা , সংস্কৃতির বাধা পেরিয়ে এ উৎসব হয়ে উঠুক আনন্দ, উদ্দীপনার এক মিলন উৎসব !! আমাদের আশা যে আপনাদের মতো আরো অনেক নতুন মানুষ জড়িয়ে পড়ুক আমাদের সাথে, দূর প্রাচ্যের এ দেশে প্রকট হয়ে উঠুক বাঙালির নৈকট্য ! IBCAJ এগিয়ে চলুক কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে, আর আমরা উদার কণ্ঠে বলে উঠি, "আয় আরো হাতে হাত রেখে / আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি"!!

https://ibcaj.org/

আমরা যারা প্রবাসে থেকে দুর্গাপূজার সময় সাধ্যমত আয়োজন শুরু করে বিদেশে সার্বজনীন দুর্গাপূজার গোরাপত্তন করি, তাদের মধ্যে যা চিরকালীন তা হল নস্টালজিয়া – দেশের প্রতি, দেশের মানুষদের প্রতি ও দেশের সংস্কৃতির প্রতি। কিন্ত আমরা আস্তে আস্তে এটাও আত্তীকরণ করতে পেরেছি যে আমরা সবাই বৈশ্বিক গ্রামের বাসিন্দা যেখানে দুরত্ব এখন ক্রমহ্রাস্যমান। প্রযুক্তির এই ম্যাজিককে কাজে লাগিয়ে দুর্গাপূজাকে মাধ্যম করে সবকটি মহাদেশের সাংস্কৃতিক সমিতির মধ্যে একটি সমন্বয়সাধন কি করা যায় – IBCAJ -এর সদস্যরা এটা ভাবতে বসি। সেই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হল এই বিদেশের বারো-ইয়ারির গত কয়েকটি পৃষ্ঠা। নিউজিল্যান্ড থেকে কানাডা, লুটন থেকে সিঙ্গাপুর – দুটি বিপরীত তির্যকরেখাদ্বারা সবকটি মহাদেশকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা, এ একমাত্র দুর্গাপূজা দ্বারাই সম্ভব। আমাদের বারো বছরে বারোটির অধিক সমিতিকে একজায়গাতে আনতে গিয়ে আমরা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করলাম তা নয়, বলাই বাহুল্য যে বন্ধুসংখ্যাও বাড়ল। সময়াভাবে সবাই এখানে লেখা পাঠাতে পারেননি, আশা করি আমরা সবাই পৃষ্ঠাভাগ করে নিতে পারব কোন এক আগামী সংখ্যায়।

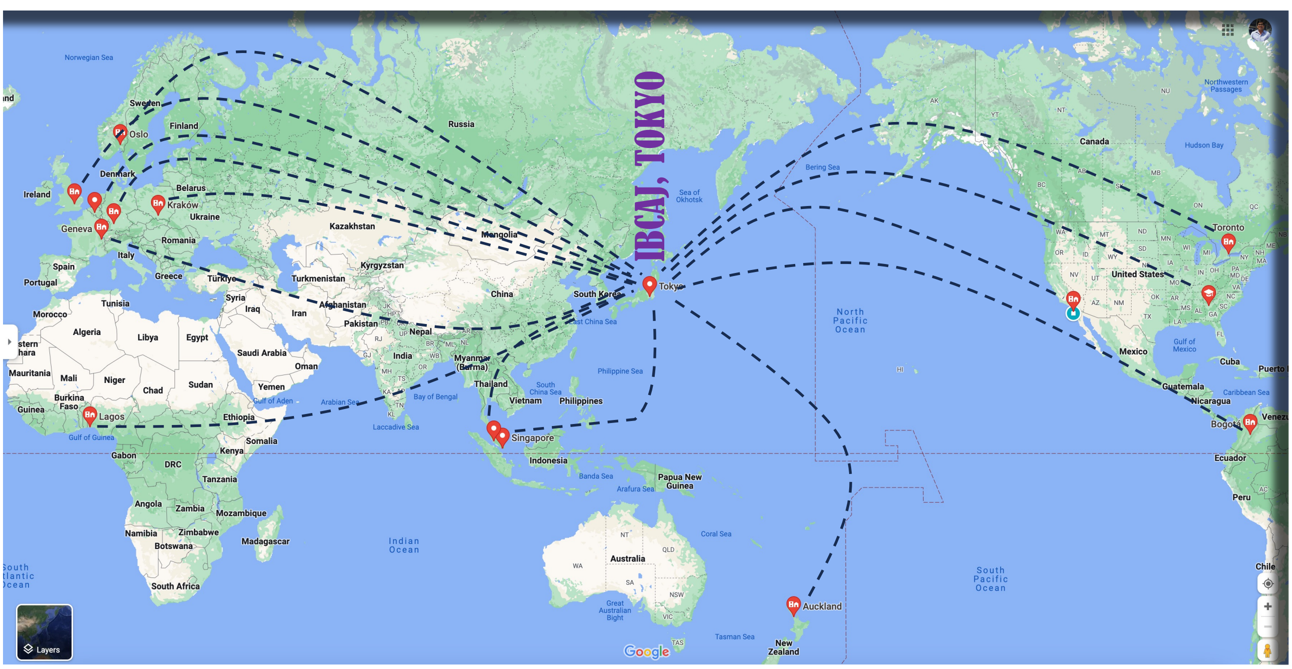

পরবর্তীকালে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন যারা:

প্রয়াস, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

"প্রয়াস" যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সংগঠন যাদের শিকড় বাংলায়। আমাদের লক্ষ্য যুক্তরাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার ও সংরক্ষণ করা এবং তা ব্রিটিশ ভারতীয়দের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আমাদের প্রয়াস হল অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় প্রবাসী যারা আমাদের সাথে হাত মেলাতে চায় তাদের নিয়ে পথ চলা।

আমরা এই বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে আমাদের যাত্রা শুরু করেছি সরস্বতী পূজো দিয়ে । ভারতীয়রা সারা বছর নানা উৎসবে মেতে থাকে। দুর্গোৎসব বা শারদোৎসব তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রতিবছর আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে এই উৎসব পালিত হয়। আমাদের সারা বছরের প্রতীক্ষা শেষ হয় মহালয়ার দিন মহিষাসুরমর্দিনী শুনে। সরস্বতী পূজোর পর, এই বছর আমরা শক্তির দেবী, মা দুর্গার আরাধনা করবো ২০শে অক্টোবর - ২২ শে অক্টোবর (শুক্রবার - রবিবার) স্ট্যানওয়েল ভিলেজ হল - ১৩ হাই স্ট্রিট, স্ট্যানওয়েল, স্টেইনস আপন টেমস এ। আমাদের পুজো শুরু বোধন দিয়ে। তারপর কলাবউ স্নান, পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপুজো, আরতি এবং দশমীতে দধিকর্মা, সিঁদুরখেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ। সঙ্গে থাকছে খাওয়া দাওয়া, হইচই, কেনাকাটা করার সুযোগ।

দেবী দুর্গার আরাধনা মুখের কথা নয়, তাও প্রবাসে বসে। সকল ব্যস্থতার মধ্যে সময় বের করে সবাই মিলে শুরু করলাম আলাপ আলোচনা। এত কম সময়ে ঠাকুর আনানো, হল ভাড়া করা, পুরোহিত মশাই খোঁজা আরো কত কি। প্রয়াস পরিবারের অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সবটা ধীরে ধীরে রূপ নিতে শুরু করলো। সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের সুবাদে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো যিনি আমাদের একটা সুন্দর এক চালার ঠাকুর দিয়ে সাহায্য করলেন। মা-তো আসছেন, কিন্তু পুরোহিত? শুরু হল খোঁজ, যারা আছেন এখানে সবাই কোন না কোন পুজোর সঙ্গে যুক্ত। ঠিক এইসময় রাজা গাঙ্গুলির সাথে আলাপ হল, কথা প্রসঙ্গে জানা গেল তিনি মেক্সিকোতে পুজো করেছেন। আমাদের আর পায় কে। হাতে চাঁদ পেলাম ওনাকে প্রস্তাব দিতে তিনিও রাজী হয়ে গেলেন।

দেশের দুর্গা পুজোর অন্যতম আকর্ষণ পুজোর গান, বিভিন্ন শারদীয়া পত্রিকা, আর পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমরা যারা প্রবাসে থাকি তারা সব সময় চেষ্টা করি যাতে দেশের মজাটা বিদেশের মাটিতে বসে পাওয়া যায়। এই পুজোর আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটা মজা সদস্যদের গানের লড়াই। তার সাথে থাকছে অন্তাক্ষরী, পুজোর কুইজ, নাচ, আর সেতার। ছোটোরাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। কেউ পিয়ানো বাজাবে তো কেউ ভায়োলিন। তাদের আবদার এই বার তারা স্টল দেবে আর সেইখান থেকে উপার্জিত অর্থ হবে তাদের কান্ট্রিবিউশন।

খাওয়াদাওয়া ছাড়া কি আর পুজো হয়। তাই রোজ থাকছে ফুড স্টল । সেখানে চাট, কচুরি, মাছের চপ, ফিশ ফ্রাই থেকে পোলাও, বিরিয়ানী সবই পাওয়া যাবে।

পূজোর মূলধন বলতে আমাদের সদস্যপদ, কিছু স্পন্সরশিপ আর কিছু উপকারীর দান। মায়ের ইচ্ছেতেই আমরা এক এক করে সব বাধা অতিক্রম করে স্বল্প পুঁজি, বুক ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা আর আশা নিয়ে আপনাদের সকলের জন্য পুজোর কটাদিন অপেক্ষা করবো।

By Prayash, London, United Kingdom

Online Only Content

SARTAJ®

THE HOUSE OF QUALITY PRODUCT

All Indian Spices, Juices, Snacks, Cosmetics and other Indian grocery products are available at Sartaj.

株式会社サルタージ　SARTAJ CO. LTD

Importer & Distributor of Indian spices and goods.

世界から品質の高いスパイスや食材を輸入し、販売しております。

〒563-0043 OSAKA-FU,IKEDA-SHI,KODA 2-10-23

株式会社サルタージ大阪府池田市神田2丁目10-23

☎072-751-1975　info@sartajfoods.jp

072-751-1976　www.sartajfoods.jp

OUR BRANDS

Mother's Recipe · MDH · Real Fruit Power · India Gate Basmati Rice · Britannia · Kitchens of India · Dabur · Mo'pleez · Himalaya Since 1930 · Khadi Natural · Vadilal Quick Treat · Haldiram's Nagpur Taste of Tradition · Denver · Dabur Herb'l Toothpaste · Sartaj The House of Quality Product · eat light, think bright Shanta G · Dabur Vatika Premium Naturals · DermoViva · BVitas · लिज्जत पापड · Swad Distinctly Different... · Aashirvaad

info@sartajfoods.jp　072-751-1975　072-751-1976　www.sartajfoods.jp

〒563-0043 OSAKA-FU,IKEDA -SHI,KODA 2-10-23　株式会社サルタージ大阪府池田市神田2丁目10-23

ইবারাকির ইজুরায় কবিগুরু

প্রবীর বিকাশ সরকার

জাপানি মনীষী, শিল্পকলার ইতিহাসবিদ শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিন বিংশ শতাব্দীর একজন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিত্ব। এশিয়া মহাদেশে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রাচ্যভাতৃবাদ তথা এশিয়ানিজম, যাকে জাপানি ভাষায় বলা হয় দাইআজিয়াশুগি তার পথিকৃৎ প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম এই মতবাদের বার্তা নিয়ে ভারতবর্ষে গমন করেন ১৯০২ সালে। ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলিকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাওয়ার আগে ওকাকুরা স্বামীজির মার্কিন শিষ্যা মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের মাধ্যমে স্বামীজিকে পত্র লেখেন। কাজেই ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজির যোগাযোগ হয়েছিল। ফলে স্বামীজি তাঁকে বেলুড় মঠে আন্তরিকভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এই সাক্ষাৎকালে স্বামীজি আনন্দের আতিশয্যে "হারানো ভাইকে ফিরে পেলাম" বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন।

প্রাচ্যের দুই মহান চিন্তকভ্রাতার এই সাক্ষাৎ কালজয়ী হয়ে আছে। স্বামীজির মাধ্যমে প্রাচ্যভাতৃবাদের বার্তাবাহী ওকাকুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ শুধুমাত্র একটি আটপৌরে সাক্ষাৎই ছিল না, জাপান ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের সুবর্ণ সূচনা ছিল, যা পরবর্তীকালে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ভাবের আদান-প্রদান ও ঘটনার মধ্য দিয়ে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল । উদীয়মান জাপান এবং স্বাধীনতাকামী মুক্তিপাগল বাংলা অঞ্চলের মধ্যে অভূতপূর্ব শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ভাববিনিময়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা আজ শতবর্ষ বেরিয়ে অব্যাহত রয়েছে।

মনীষী ওকাকুরা দুবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ভারতকে আবিষ্কার করেছিলেন - একবার ১৯০২ সালে এবং আরেকবার ১৯১২ সালে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে মোট পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করে জাপানকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আমেরিকায়ও কবিগুরু পাঁচবার গিয়েছিলেন, কাজেই জাপানেও পাঁচবার আগমনের গুরুত্ব কতখানি ছিল সহজেই অনুধাবন করা যায় । তবে জাপানভ্রমণ তাঁর জন্য যতখানি আনন্দময়, প্রাণের জন্য আরামদায়ক এবং শিক্ষণীয় ছিল, তেমনটি আমেরিকার ক্ষেত্রে ছিল না। তার কারণ জাপানিরা তাঁকে যে-রকম আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, মার্কিনীরা তা নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে স্বামীজিকে মার্কিনীরা যেভাবে গ্রহণ করেছেন তেমনটি ঘটেনি ওকাকুরার ক্ষেত্রে । কিন্তু বিবেকানন্দ-ওকাকুরা-রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিদিকপালের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন এশিয়া মহাদেশের ক্ষেত্রে এক অনন্য উজ্জ্বল তাৎপর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ইতিহাস বললে আদৌ মিথ্যে বলা হবে না। তিনজনই তাঁদের বিশেষ চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বামীজি বড়ই অকালে লোকান্তরিত হন ওকাকুরা তেনশিনের ভারতে অবস্থানকালে ১৯০২ সালে । এই ঘটনার পর ওকাকুরাও ১৯১৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫০ বছর বয়সে । তাঁর মৃত্যুর পরপরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়ায় প্রথম নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ওকাকুরা জীবিত থাকলে কী যে খুশি হতেন, তা কল্পনাও করা যায় না! ওকাকুরার মহাপ্রয়াণের পর ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বন্ধু ওকাকুরার দেশ জাপান ভ্রমণে আসেন। তখন জাপানে তাঁর জনপ্রিয়তা পর্বতসমান - নোবেল পুরস্কারের বদৌলতে।

প্রথম ভ্রমণের সময় জাপানের একাধিক বিখ্যাত স্থানে তিনি যান এবং বক্তৃতা করেন। বহু জাপানি তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর দীর্ঘ চুল-দাড়ি-গোফের কারণে তাঁকে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মতো দেখায় বলে জাপানিরা তাকে 'শিসেই" বা "*ঋষিকবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। যেখানেই গিয়েছেন তিনি বিপুল অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। কবিগুরু তাতে এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে, ৩রা আষাঢ়, ১৩২৩ সাল তথা ১৯১৬ সালের ১৭ জুন শনিবার, নগেন্দ্রনাথ দত্তকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, "জাপানে এসে এক কাজ হয়েছে ... এত অজস্র আদর অভ্যর্থনা আমার জীবনে আর কোথাও পাইনি ।" বাস্তবিকই তাই । কোবে, ওসাকা, টোকিও, য়োকোহামা মহানগরী; নাগানো প্রদেশের কারুইজাওয়া শহর এবং ইবারাকি প্রদেশের ইজুরা নামক স্থানে কবিগুরু অসামান্যরূপে সংবর্ধিত এবং ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এই সকল স্থানগুলোর মধ্যে "ইজুরা" ছিল ভিন্নরকম। কারণ, ইজুরায় তিনি গিয়েছিলেন প্রয়াত বন্ধু ওকাকুরার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং বিধবা পত্নী ওকাকুরা মোতোকোসহ ওকাকুরার বংশধর ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য । ওকাকুরা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে জয় করেছিলেন ভারতে অবস্থানকালেই । ওকাকুরার কল্যাণেই তিনি প্রাচ্যসংস্কৃতি, প্রাচ্যাদর্শ এবং জাপানকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন । ভারতে অবস্থানকালে ওকাকুরা তার জীবনের প্রথম গ্রন্থ "The Ideals of the East" রচনা করেন, যা ১৯০৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথম বাক্যটিই হচ্ছে: "Asia is One", অর্থাৎ "এশিয়া একটিই" । এই আপ্তবাক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন।

এশিয়ায় যে শান্তি, মৈত্রী ও সহ-অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি--_ওকাকুরা সেটা শতবর্ষ আগেই অনুধাবন করেছিলেন চীন ও ভারত ভ্রমণ করার মধ্য দিয়ে । যা তখনও স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ধারণার মধ্যেই ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। ওকাকুরার দ্বিতীয় গ্রন্থ "The Awakening of Japan" যা ১৯০৪ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিও প্রমাণ করে যে জাপান ও ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আদর্শ কতখানি সমৃদ্ধ এবং পাশ্চাত্যের জন্য শিক্ষণীয় । এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটেতে দেখা যায় কী গভীরভাবেই না তিনি ভারতবর্ষের অমূল্য আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক সম্পদ বেদ, উপনিষদ, গীতা, এবং প্রাচীন ইতিহাসকে আত্মস্থ করেছিলেন! তা ছাড়া, ১৯০৬ সালে তার তৃতীয় গ্রন্থ "The Book of Tea" নজিরবিহীন এক অসাধারণ গ্রন্থ। এতে রয়েছে চীনের প্রাচীন প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির প্রভাবে জাপান তথা প্রাচ্যের শান্তিবাদী চিন্তাচেতনার শিক্ষণীয় নান্দনিক বহিঃপ্রকাশ, ভাতৃবন্ধনের, মৈত্রীবন্ধনের অনন্য পন্থার বহুমুখী দিক।। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে একটি সবুজ প্রতিবাদ। ১৯১৬ সালে জাহাজে এই গ্রন্থটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ জাপানে আগমন করেন। এই তিনটি গ্রন্থই রবীন্দ্রনাথকে ওকাকুরার মনন ও তাঁর জন্মভূমি জাপানকে অনুধাবন করতে সহায়ক হয়েছিল । জাপানে বক্তৃতাকালে ওকাকুরার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তাঁর মেধা ও চিন্তার। বলা বাহুল্য, ওকাকুরার প্রভাবে জাপান রবীন্দ্রনাথকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। তার রচিত "জাপান যাত্রী" ক্ষুদ্র গ্রন্থটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ হলেও, বলা যায় এই গ্রন্থটি তার জাপান-দর্শনের খণ্ডিত বিবরণমাত্র। অনেক কিছুই রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি, তার জীবদ্দশায় জাপান সম্পর্কে । অনেক জাপানি ব্যক্তিত্বের নামও তিনি স্মরণ করেননি, যাদের দ্বারা তিনি নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যাঁরা উদারভাবে অকুণ্ঠচিত্তে সাড়া দিয়েছিলেন ।

কিন্তু ওকাকুরাকে তিনি আমৃত্যু ভুলতে পারেননি তা আর না বললেও চলে | জীবদ্দশায় যতজন জাপানি নাগরিকের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেছে, জাপানে-ভারতে-চীনে-আমেরিকায় প্রায় সকলেই ছিলেন ওকাকুরার প্রত্যক্ষ ছাত্র, না হয় তার ভাবশিষ্য । এখনও ওকাকুরার প্রভাব জাপানি মননে প্রবলভাবে উপস্থিত ।

ওকাকুরা যে কতখানি প্রভাবশালী ও নমস্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুবার সশরীর জাপানে উপস্থিত হয়ে সেটা অনুভব করে আন্দোলিত হয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯১৬ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯২৯ সালে এবং ইবারাকি প্রদেশেরই "ইজুরা" এবং "মিতো" নামক স্থানে (মিতোর ঘটনা অন্যত্র লিখেছি) ।স নাগানো প্রদেশের কারুইজাওয়া শহর থেকে ট্রেনে চড়ে কবিগুরুর প্রথমবারের ইজুরা ভ্রমণ থেকে জানা যায় যে বন্ধু ওকাকুরার সমাধি পরিদর্শনকল্পে ২২ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত চারদিন ইবারাকি-প্রদেশের কিতাইবারাকি শহরে অবস্থান করেন। ওকাকুরার শোকাহত পরিবার এবং ইজুরার মধ্যবর্তী সেকিমোতো রেলস্টেশনে (বর্তমানে ওওৎসুমিনাতো স্টেশন) আগত স্থানীয়দের দ্বারা অভূতপূর্ব উষ্ণ আতিথেয়তা ও অভ্যর্থনা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর দলবলকে নিয়ে দশের অধিক "জিনরিকিশা" বা "হাতেটানা রিকশা" ইজুরার দিকে যাত্রা করেছিল সারিবদ্ধভাবে। পত্রপত্রিকায় প্রচুর ছবি ছাপা হওয়ার কারণে রবীন্দ্রনাথকে চিনতে স্থানীয় কারও কোনো বেগ পেতে হয়নি। ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় ইজুরা শহরে ।

এই চারদিন অবস্থানকালে কবিগুরু ওকাকুরার বাড়িতে যান, তার পরিবকবিগুরু বন্ধু ওকাকুরার স্মৃতিচারণা করেনন বাড়ির বাগানে পরিবার-পরিজনসহ একাধিক আলোকচিত্র ধারণে অংশ নেন। ওকাকুরার সহধর্মিণী শ্রীমতী মোতোকো কবিগুরুকে জাপানি ঐতিহ্যবাহী "ইউকাতা" গ্রীষ্মকালীন হালকা পোশাক) এবং "হাওরি" (ইউকাতার ওপর হালকা পরিধান) উপহার দিয়েছিলেন | "হাওরি"তে ওকাকুরা পরিবারের নিজস্ব পরিচিতি চিহ্ন ক্রেস্ট সংযুক্ত ছিল। সেটা পরেই তিনি প্রয়াত বন্ধু ওকাকুরার সমাধিতে ফুলসমেত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওকাকুরা কর্তৃক প্রশানশ মহাসাগরের তীরে নির্মিত ছয় কোণবিশিষ্ট নান্দনিক বিশ্রামস্থল "রোকুকাকুদোও" কুঠুরিতে প্রতিদিনই ধ্যান করেন এবং স্মরণ করেন ওকাকুরাকে । কুঠুরীতে বসে থাকলে বাইরের সামুদ্রিক উত্তাল ঢেউ এবং বাউড়ি বাতাসের শব্দ অদ্ভুত এক আরাম ও প্রশান্তি এনে দেয় মনে। রবীন্দ্রনাথেরও তাই হয়েছিল বলা বাহুল্য । তা ছাড়া, সমুদ্রের নীল জলে আকাশের ডুবে যাওয়া সৌন্দর্যলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আনমনা করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথের এই দৃশ্য যে ভালো লেগেছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। জীবদ্দশায় ওকাকুরাকে যে মাঝি নৌকোতে করে সমুদ্রবিহার বা ছিপ দিয়ে মাছ ধরার জন্য নিয়ে যেতেন সেই বৃদ্ধমাঝির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে ।

ওকাকুরার বাড়িতে প্রয়াত ওকাকুরা স্মরণে তিনি কাগজের ওপর সংস্কৃত অক্ষরে "ঔম" শব্দটি লিখে বন্ধুপত্নী শ্রীমতী ওকাকুরা মোতোকোকে উপহার প্রদান করেন। পরবর্তীকালে ওকাকুরার পৌত্র ওকাকুরা কোওশিরোওর উদ্যোগে সেটা স্থানীয় চোওশোওজি বৌদ্ধমন্দিরে সংরক্ষিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি হিসেবে প্রতিটি জিনিসই কী যে যত্নসহকারে সংরক্ষিত আছে জাপানের বিভিন্ন স্থানে তা বাঙালিরা কল্পনাও করতে পারবে না! ইজুরা তথা ইবারাকি প্রদেশেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়

না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইজুরা ভ্রমণ করবেন বলে তাঁকে সঙ্গ প্রদান করেন বন্ধুবর চিত্রশিল্পী য়োকোয়ামা তাইকান, চিত্রশিল্পী কানজান শিমোমুরা, চিত্রশিল্পী হাশিমোতো গাহোও, চিত্রশিল্পী কিমুরা বুজান প্রমুখ | এরা শিল্পাচার্য ওকাকুরার প্রধান ছাত্র এবং জাপানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ যাতে নির্ভুলভাবে পৌছুতে পারেন ইজুরাতে তার জন্য শিল্পী তাইকান একটি পথনির্দেশ-মানচিত্র এঁকেছিলেন | এটা সুদীর্ঘ বছর রবীন্দ্রনাথের তখনকার ভ্রমণসঙ্গী চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দের কাছে ছিল, ১৯৯৮ সালে সংগ্রহ করে এনে ইবারাকি তেনশিন স্মারক শিল্পকলা জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কবিগুরুর ইজুরা ভ্রমণের সময় দোভাষী ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে ছিলেন ওকাকুরার অনুজ ওকাকুরা য়োশিসাবুরোও, তিনিও ওকাকুরার মতো খুব ভালো ইংরেজি জানতেন এবং ইংরেজি ভাষার শিক্ষক ছিলেন | তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ওকাকুরা তাকাকোর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার বাড়িতে রন্ধনকৃত হাঁসের মাংস সানন্দে উপভোগ করেছিলেন | কবিগুরু সকালের জলখাবার হিসেবে পছন্দ করতেন পাউরুটি | সেটা ইজুরার মতো আধাশহর-আধাগ্রাম স্থানে পাওয়া যেত না বিধায় টোকিওর ব্যয়বহুল শহর "গিনজা" থেকে ত্রয় করা হতো, আর সেটা ভোরবেলা ট্রেনে আসত | এই ট্রেনটি দ্রুতগামী ট্রেন বলে সাধারণ স্টেশনে থামত না, চলন্ত অবস্থায় ড্রাইভারের ছুঁড়ে দেওয়া পাউরুটি স্টেশনমাস্টার গ্রহণ করতেন।

চিত্রশিল্পী হাশিমোতো গাহোওর কনিষ্ঠ পুত্র হাশিমোতো হাজিমের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, কৈশোরে তিনি ইজুরায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওকাকুরার বাড়িতে একটি ছোট্ট পদ্মফোটা পুকুর রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করেছিলেন | যেহেতু ভারতেও পদ্মফুল ফোটে, তাই মনে মনেএকটা আত্মীয়তাও অনুভব করেছিলেন তিনি । আগস্ট মাস বলে তখন পদ্ম ফুটেছিল | সেই পদ্মের গোলাপি আভার সৌন্দর্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। হাজিমে একপাতা সোনালি রঙের কাগজ এগিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করলে কবিগুরু ছোট্ট একটি কবিতা ইংরেজিতে লিখে প্রদান করেন। কবিতাটি নিম্নরূপ:

The lotus of our clime
blooms here in the alien
water with the same sweetness,
under another name.

২০০৯ সালে এই লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল ইবারাকি-প্রদেশের সুবিখ্যাত ৎসুকুবা শহরে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করার । আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় অধিবাসী কতিপয় রবীন্দ্রভক্ত । তখন ইজুরা ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। পরিদর্শন করেছিলাম প্রাচ্যভাতৃবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্র-ষ অনুরাগী ওকাকুরা তেনশিনের বাড়িটি, যা এখন ওকাকুরা স্মারক জাদুঘরের অধীনে ওকাকুরা তীর্থস্থান । দেখা হয়েছিল লালরঙা রোকুকাকুদোও কুঠুরিটিও। এই কুঠুরিটিতে বসে কবিগুরু একদা ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, ভাবতেই বুকের ভেতরটা অদ্ভুত এক ভালো লাগায় নেচে উঠল! দেখতে পেলাম ওকাকুরার বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি পাথুরে স্তম্ভ, তার শরীরে খোদিত আছে ওকাকুরার মুখাবয়ব এবং জাপানি ভাষায় "আজিয়া ওয়া হিতোৎসু নারি" বা "Asia is One" আপ্তবাক্যটি।

ইবারাকি তেনশিন স্মারক শিল্পকলা জাদুঘরে রয়েছে ওকাকুরার অনেক স্মারক বস্তু, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় কবি ও সমাজসেবী প্রিয়ম্বদা দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওকাকুরার পত্রবিনিময়ের অনেকগুলো ইংরেজি প্রেমপত্র এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেক দলিলপত্র । প্রাচ্যভাতৃবাদের উদগাতা ওকাকুরা তেনশিন শেষজীবন ইজুরাতেই কাটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের কারণে ইজুরা আজ রবীন্দ্রস্মৃতিতীর্থ হিসেবেও জাপানিদের কাছে সুপরিচিত ।

VISHWAS®
YOUR TRUSTED PARTNER
VISHWAS CO. LTD.
YOUR TRUSTED PARTNER
Import, Export & Distributor of Spices
If it's about spices, go to VISHWAS!
DAAL
MOONG DAL YELLOW
イエロームングダール
MOONG DAL
ムングダル
ROASTED GRAM DAL
ローストチャナダル
BOTTLE SPICES
BLENDED SPICES
Chat Masala
BBQ Tandoori Masala
Kitchen King Masala
Chicken Curry Masala
Kasoori Methi
Garam Masala
PEELED TOMATOES IN TOMATO JUICE
SWEETS & SNACKS
661-0961, Hyogo-Ken, Amagasaki-Shi, Tonouchi-Cho, 2-1-7
〒661-0961兵庫県尼崎市戸ノ内町2-1-7
Tel. : 06-6493-7888 • Fax : 06-6493-7885
www.vishwasjapan.com • e-mail : vishwasjapan@gmail.com
Your order is an APP
Official LINE
Please Follow me!!

পাঠ প্রতিক্রিয়া- নরওয়েজিয়ান উড

আলমগীর হোসেন বৈদ্য

"নরওয়েজিয়ান উড" পড়া শেষ হলো কাল ভোররাতে। শেষ পাতাটা উল্টোনোর পরে প্রথমেই মনে হলো — এতটা বিষণ্ণতা, এতখানি অবসাদ প্রসেস করতে পারবো তো? জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় প্রশ্ন করেছিলেন — কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? মুরাকামি বাসেন, এটুকু নিশ্চিত। কাফকা তামুরা হোক বা সুকুরু তাজাকি — মুরাকামির মূল চরিত্র সর্বদা বড় অতৃপ্ত; সে নিজে কী চায় নিজেও জানে না। আর সেই নিজেকে আবিষ্কার করার যাত্রাটাই এক একটা উপন্যাস হয়ে ওঠে। এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গ, এক সম্পর্ক থেকে অন্য সম্পর্ক, এক পলায়ন থেকে আরেক পলায়নের দাস্তান।

এই উপন্যাসে বাড়তি আছে — এক বিষাদ থেকে পরের বিষাদ, মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে এগিয়ে চলা। একের পর এক আত্মহত্যা। কোনোটারই একটা নির্দিষ্ট কোনো কারণ বা ট্রিগার নেই। না থাকাই তো স্বাভাবিক। যেমন নাওকো মেয়েটা যেদিন আত্মহত্যা করলো সেদিন সে সবথেকে খুশি। যেনো দীর্ঘ মানসিক অবসাদের পরে শেষমেষ সে বাঁচার পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পেয়েছে। মুখেও বলছে ফ্রেশ স্টার্টের কথা। আর তারপরই···

জয় গোস্বামীকে মনে পড়ে –

"কেউ কি মৃত্যুর আগে স্নান করে?
অন্যান্য দিনের মতো সাবধানে সিঁদুর পরে কেউ?
আত্মহত্যা করবে জেনে কেউ কি বাড়ির জন্য মাছ কিনে আনে?
···
কখন কার ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হবে সে কথা পাশের লোক জানে?"

"নরওয়েজিয়ান উড" লেখা ১৯৮৭ সালে। মুরাকামির পাঁচ নম্বর উপন্যাস। তাঁর প্রথম চারটে উপন্যাসের একটাও আমি পড়িনি, এখনও পর্য্যন্ত। এই বইটায় অনুবাদকের নোটস পড়ে জানছি "নরওয়েজিয়ান উড"ই লেখককে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। তাঁর আগের উপন্যাসগুলো একশ্রেণীর পাঠকমহলে সমাদৃত হলেও সে অর্থে 'গণ' হয়ে উঠতে পারেনি। "নরওয়েজিয়ান উড" পেরেছিলো। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো যে পাঠক এর আগে তাঁকে 'আমাদের' মনে করেছিলো তাঁরা এবার তাঁকে মেইনস্ট্রিমের কাছে বিকিয়ে যাওয়া সেলআউট বললো। কারণ এক দিক থেকে দেখলে বইটাকে অনায়াসে টিনেজ প্রেমের উপন্যাস বলা যায়। যে ঘরানা দিস্তা দিস্তা লেখা হয় সব দেশে, সব সময়েই। আশি বা নব্বইয়ের জাপান যা নাকি আরোই চলতো বাজারে। লেখক নিজে অবশ্য বলেছেন — "নরওয়েজিয়ান উড" একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার ছিলো তাঁর কাছে, একটা নতুন পরীক্ষা, একটা ঝুঁকি। বলা বাহুল্য, পরীক্ষাই হোক বা ঝুঁকি, তিনি সফলভাবে উতরে গেছিলেন।

এই যে এই উপন্যাসটাকে 'বাজারি' বলে দেগে দেওয়া এর একটা বড় কারণ বোধহয় লেখকের প্রথমবার জনপ্রিয় পপ-কালচারের একাধিক মোটিফ ব্যবহার করা। যেমন বইটার নাম বিটলসের একটা ভীষণ সুন্দর গানের নামে। গানটার লিরিক্স খেয়াল করলে বইটার নামকরণের কারণটা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। আমাদের কাহিনীর নায়ক তোরু ওয়াতানাবের কৈশোর-যৌবনের সবকটা সম্পর্কই গানের কথকের মতো। জড়িয়ে পড়া। তারপর ঘুম ভাঙলে খেয়াল হওয়া 'দিস বার্ড হ্যাজ ফ্লোন' টু। সেই তোরু তার মাঝবয়সে একদিন গানটা শুনতে শুনতে হারিয়ে যায় নিজের সদ্যযৌবনে। স্কুলে সে, তার বন্ধু কিজুকি আর কিজুকির প্রেমিকা নাওকো ছিলো হরিহর আত্মা। কিজুকি একদিন আচমকাই আত্মঘাতী হলো। আর সেই শোক থেকে পালিয়ে তোরু চলে এলো অন্য একটা শহরে কলেজ জীবন শুরু করতে। সেখানে বহুকাল পরে সাবওয়েতে (আমাদের মেট্রোরেল) নাওকোর সাথে আবার দেখা। ক্রমশ জড়িয়ে পড়া। নাওকোর প্রিয় গান ছিলো 'নরওয়েজিয়ান উড'।

নাওকো। অন্তর্মুখী, বিষণ্ন, স্পর্শকাতর এক চরিত্র। তার বড়বোনও আত্মঘাতী হয়েছিল। মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলো সেই। সেই অভিঘাত সামলে নেওয়ার আগেই প্রথম ভালোবাসা কাজুকির আত্মহত্যা। এই অল্প বয়সে! একমাত্র সাপোর্ট সিস্টেম হতে পারতো যে বন্ধু সেও শহর ছেড়েছে। ক্রমশ দীর্ঘমেয়াদী ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিই বা ভবিতব্য ছিলো তার? তোরুর সাথে কিছুদিনের প্রণয় বা দূর স্যানেটোরিয়ামে রেইকোর বন্ধুত্ব সেই পরিণতিকে বিলম্বিত করেছিলো মাত্র।

নাওকো যখন স্যানেটোরিয়াম এবং তোরু কলেজে একা তখন তার জীবনে আসবে মিদোরি। নাওকোর ঠিক উল্টো। হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছ্বল। একটু বেশিই প্রাণোচ্ছ্বল, সময় সময় পাগলাটেই মনে হয় তাকে। কিন্তু তারও আছে নিজস্ব যন্ত্রণা। মা মারা যাওয়ার শোকস্তব্ধ বাবা বলেছিলো এর বদলে সে বা তার বোন মরলে পারতো। অপরিণত বয়ঃসন্ধির সন্তান বাবার মুখ থেকে শোনা নিজের এই মৃত্যুকামনা কীভাবে প্রসেস করবে? এই গভীর ক্ষত ভুলতেই কি তার এই ডাকাবুকো হাবভাব, উচ্ছৃখলপ্রিয়তা নয়? অতঃপর যখন সে খুঁজে পাবে প্রেম ও প্রেমিক, তখনও সে পাবে এমন একজনকে যে এখনও নিজের পুরাতন প্রেম, বা বলা ভালো সেই প্রেমের স্মৃতির এক অলীক বিশ্বে বেঁচে আছে। নাওকো মারা যাওয়ার পরেও তোরুকে কি পুরোপুরি কোনোদিনও পাবে মিদোরি? সেই প্রশ্ন জিইয়ে রেখেই উপন্যাস শেষে করেন লেখক।

তোরু, নাওকো, মিদোরির কথা হলো। বললাম কিজুকির কথাও যার উপস্থিতি, বা বরং অনুপস্থিতিই, উপন্যাস জুড়ে হন্ট করে গেছে বাকি চরিত্রগুলোকে। রেইকোর উল্লেখও করেছি, তবে সে আরেকটু বিস্তারিত উল্লেখের দাবি রাখে হয়তো। নির্জন পাহাড়ের সেই স্যানেটোরিয়ামে রেইকো একাধারে নাওকোর রুমমেট, বন্ধু এবং সহযোদ্ধা। এই যুদ্ধের একমাত্র সার্ভাইভরও সে। গল্পের শেষে তার জন্য মনটা খুশি হয়ে যায়।

আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে নাগাসওয়াকে। যদিও পার্শ্বচরিত্র, তবু খেয়াল করলে তার আস্তরণগুলো বিমোহিত করে। আমাদের ভিক্টরিয়ান মরালিটির বিচারে নাগাসওয়া দুশ্চরিত্র, বড়লোক বাপের পয়সায় ফুর্তি করা এক্সট্রভার্ট। কিন্তু সে জীবনটাকে নষ্ট করছে এরকম না। সে তার কেরিয়ারের লক্ষ্যে অবিচল। ডর্মের আর পাঁচজনের থেকে বরং সে অনেক বেশি পরিশ্রমী। তার চরিত্রে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আছে। একদিকে সে

ওমানাইজার, সমস্ত হইহইয়ের প্রাণভোমরা; অন্যদিকে সে ইমোশনালি হ্যান্ডিকাপ্ড। তার সত্যিকারের কাছের লোকদেরও নিখাদ ভালোবাসা বা সমবেদনা জানাতে সে অপারগ। আমি উপন্যাসটার অনেকগুলো রিভিউতে দেখলাম একাধিক পাঠক এই চরিত্রটার প্রতি রাগ আর ঘেন্না ব্যক্ত করেছেন। আমার শুধুই মায়া হলো। খারাপ লাগলো নাগাসওয়ার জন্য।

হতাশার কথা হলো, মোটিফের কথা হলো, চরিত্রদের নিয়ে বকবক করলাম। শেষে ব্যাকড্রপ। যা আমার স্বতন্ত্র চরিত্র বলে মনে হয়েছে। ১৯৬০এর জাপান। উত্তাল ছাত্র রাজনীতি। সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে দেওয়ার কথা হচ্ছে। পুলিশের ব্যাটন নামছে। কালকের আগুনখেকো ছাত্রনেতা আজ বহিষ্কারের ভয়ে মন দিয়ে ক্লাস করছে। সামান্যতম স্খলনে অন্যকে শ্রেণীশত্রু বা 'এনিমিজ অফ দ্য কজ' বলে চিহ্নিত করেছিল যে রাজনীতিসচেতন, তরুণ মার্ক্স-বিশারদ প্লেসমেন্ট নিয়ে সে চাকরি করতে চলে যাচ্ছে টয়োটা বা আইবিএম বা অন্য কোন বহুজাতিক সংস্থায়। ১৯৬০এর জাপান আর এই শতক বা দশকের আমরা বা আমাদের বৃত্ত বা বুদবুদ কোথাও গিয়ে মিলে যায়, তাই না?

মুরাকামির বাকি উপন্যাসগুলো পড়ে ফেলার অপেক্ষায় আছি। কাফকা অন দ্য সোরের মায়াবাস্তবতা সত্য, কিন্তু মুরাকামির দুনিয়ায় শেষ সত্য যে নয় এই বিষন্নতার উপাখ্যান তারই প্রমাণ। এই যদি হয় তার "মূলধারা"র "মোটামুটি" লেখা, বিকল্প ধারার জাপানি সাহিত্যের সাথে "বেইমানি", তবে আগের চারটে উপন্যাস কেমন ছিলো এ কৌতুহল যাচ্ছে না।।

এপ্রিলের কবিতা

অর্ঘ্য দীপ

ক্ষমাহীন এপ্রিল, বিষণ্ণ গ্রীষ্মের দিনে
নামহীন কিছু ফুল ফুটে ওঠে স্মৃতির কফিনে

সুবাস ছড়িয়ে পড়ে, রহস্যময় সে বাতাসে
কবেকার ইচ্ছেরা এলোমেলো মেঘ হয়ে আসে

সেই মেঘে লেখা থাকে মেয়েটির নাম ও ঠিকানা
কখনও যে ফিরবে না, এই কথা শুরু থেকে জানা

তবুও ঝড়ের আগে, হাওয়া বয়ে চলে ভুল দিকে
অবুঝ বালক খোঁজে মায়াবিনী কোনও কিশোরীকে

জন্মে-জন্মে ঠিক এভাবেই বিষাদেরা জাগে
চেনা মুখ মনে এলে এখনও কোথাও যেন লাগে

অপেক্ষা শেষ হয়, শেষ হয় গ্রীষ্মের দিন
নামহীন কিছু ফুলে ঢেকে যায় স্মৃতির কফিন...

প্রবাস

শৌভিক সেন

পালিয়ে যাবার রাস্তা পেলেই ছুট লাগাবো,
বড্ড বেশী জড়িয়ে যাচ্ছি এই শহরে,
অনেক আদর দিচ্ছে, তবু মন ভরেনা,
মাঝে মাঝে বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ যদি হাত ছাড়িয়ে দুয়েকটা দিন,
ঘুরেই আসি, সত্যি কী আর ভুলিয়ে দেবে?
রাগ হবে, আর দুঃখ, সেতো জানা কথা,
কাছে এলে আবার ঠিকই ফিরিয়ে নেবে।

আদরবাসা, ভালোবাসার এই যে ফারাক
দুটোই প্রিয়, ওদের কাছে অনেক চাওয়া,
এই যে দু'দেশ ছুঁয়ে থাকার পরকীয়া—
এরই মানে, এই আকালেও, বেঁচে যাওয়া।

বৃষ্টি বলুক

সুচিহ্নিত (সন্দীপ সেনগুপ্ত)

নাই বা হলো লেখা, আমার এক সমুদ্র গান,
তোর মাঝে হারিয়ে গেছে, হাজার গীতবিতান।

আলগোছে রোদ, ক্লান্ত বিকেল, মেঘ পিওনের ডানা,
তোর গল্প না হয় বৃষ্টি বলুক আর আকাশের আল্পনা।

দিস্তা ভরা সাদা কাগজ, জমে মুক্ত রাশি রাশি
তোর মুখেই লুকিয়ে আছে মোনালিসার হাসি।

তোর চোখের তারায় দিতো ধরা কবির দু চোখ যবে,
ঠিক নতুন কোনো গীতাঞ্জলির সৃষ্টি হতো তবে ।

আছে খয়েরি পুকুর, শালুক নদী, ওই মন খারাপের সন্ধ্যা,
তোর আসার আশায়, আজও প্রদীপ জ্বালায়, সেই রজনীগন্ধ্যা ।

বৃষ্টি নামে, আকাশ কাজল, আমার চলতি পথের সঙ্গী,
তোর মন কেমনের সব কটা রঙ, থাক আমার মনে বন্দি ।

প্রতিবাদের ময়দানে

শুভব্রত মুখার্জী

১৯৬৭ র বসন্ত। আমেরিকার Houston। সকাল সাড়ে আটটা। দীর্ঘদেহী , কৃষ্ণাঙ্গ , বছর পঁচিশের ছেলেটাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে Houston Military Entrance Processing Station এ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য আমেরিকার সেনাদলে লোক নেওয়া হচ্ছে। যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ! মানে Drafting I এই ছেলেটি এর আগের কতগুলো Drafting এর পরীক্ষায় পাস করতে পারেন নি। ফলে যুদ্ধে যেতে হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবারের পরীক্ষায় পাস করে গেছে। আসলে, যুদ্ধে যাবার জন্য যথেষ্ট লোকজন না পেয়ে আমেরিকার সেনাবাহিনী পরীক্ষার পাস নম্বর দিয়েছে কমিয়ে । ফলে দলে দলে লোকজন এবার পাস করেছে । তাদের অনেককেই ডাকা হয়েছে এদিন Houston এর অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। যার পোশাকি নাম Induction ! Induction ceremony তে প্রথমবার এই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটার নাম ধরে ডাকা হলো। নিয়ম হচ্ছে , নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লাইন ছেড়ে এগিয়ে যেতে হবে । সেটাই যুদ্ধে যোগদান করার সম্মতি। কিন্তু না , নাম ঘোষণার পরও ছেলেটা লাইন ছেড়ে এগোলো না। Drafting এর দায়িত্বপ্রাপ্ত বড়কর্তাদের কপালে ঘাম জমলো। এ ছেলেটা সাধারণ কেউ নয়। সারা দেশের নজর আছে এর দিকে। তাই এক মেজকর্তা ছেলেটাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝালেন যে যুদ্ধে না গেলে কপালে দুঃখ আছে। অন্তত ১০ হাজার ডলার জরিমানা। সাথে ৫ বছরের জেল। ছেলেটা শুনলো চোয়াল শক্ত করে। পরের বার নাম ডাকা হলো আবার। কিন্তু না , এবারও এগোলো না ছেলেটা। শেষবার নাম ডাকা হলো। তাতেও ছেলেটা অনড়।

সেদিন আর তারপরে অনেকবার অনেকবার স্পষ্ট ভাষায় সে জানিয়ে দিলো যে তার ধর্ম তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে সম্মতি দেয় না। আর তার থেকেও বড় কথা আমেরিকা থেকে প্রায় দশ হাজার মাইল দূরে কিছু নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করাতে তার প্রবল অনিচ্ছে। এরকম অনড় সে থেকেছে পরের প্রায় ৫ বছর। জরিমানা হয়েছে , জেল এ যাবার আদেশ হয়েছে। একটানা আইনি লড়াই লড়ে গেছে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক। না ! যুদ্ধে যেতে হয়নি। জেল -জরিমানাও হয়নি। শুধু সারা পৃথিবীতে সাড়া পরে গেছিলো। সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী মানুষের কাছে রাতারাতি Icon হয়ে উঠেছিলেন তিনি। যদিও তিনি আগে থেকেই ছিলেন একজন Icon I ক্রীড়াজগতে। ১৯৬৭ র আগেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। ১৯৭১ এ আইনি লড়াই শেষ করে , হাজার ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে আবারো হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

ছেলেটার নাম Cassius Marcellus Clay Jr. ওরফে Md Ali !

রাজনৈতিক , সামাজিক প্রশ্নে ক্রীড়াবিদদের প্রতিবাদের কাহিনী বেশ লম্বা ! যুদ্ধবিরোধ , নারী- পুরুষের সমানাধিকার , বর্ণবিদ্বেষ , স্বাধীনতার লড়াই , গণতন্ত্রের লড়াই এ সবই বারবার এসে পড়েছে খেলার মাঠে। তার মধ্যে Houston এর টা উজ্জ্বলতম ঘটনাগুলোর মধ্যে একটা নিঃসন্দেহে ! কিন্তু এরকম প্রতিবাদের ইতিহাস আরো অনেক পুরোনো।

যেমন ১৯০৬ সালের এথেন্স এর Summer Olympic এর কথাই ধরা যাক। পেশায় উকিল Irish Long Jumper , Peter O' Conor খুব চেয়েছিলেন Ireland এর হয়ে Olympic Long Jump এর ইভেন্ট এ যোগ দিতে । কিন্তু পারেন নি। Ireland এর আলাদা দলের তখন Olympic এ প্রতিনিধিত্ব করার অনুমতি ছিল না। সে ঘটনা ঘটেছে আরো অনেক পরে। সেই ১৯২৪ সালে। ১৯০৬ সালের এথেন্স Olympic এ Peter কে তাই প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছিল Great Britain এর হয়ে। যে ব্রিটিশদের সাথে আইরিশদের তখন আদায় কাচঁকলায় সম্পর্ক , সেই ব্রিটিশদের হয়েই কিনা লড়তে হবে Olympic এ ! কিন্তু প্রবল আইরিশ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী Peter এর আর উপায় ছিল না কিছু। বেশি বেগড়বাই করতে গেলে Olympic এ যাওয়াটাই বারণ হয়ে যেত। তাই Peter মনে মনে অন্য প্ল্যান করেছিলেন। Long Jump এ রুপো পাওয়ার পর করে ফেললেন এক অভাবিত ঘটনা। আধুনিক Olympic শুরু হওয়ার পরে , সারা বিশ্বের কাছে এত বড় মঞ্চে আর কেউ এরকম ঘটনা ঘটান নি। মেডেল পাওয়ার পর যখন Union Jack উড়ছিল ফ্ল্যাগপোলের মাথায় , এক লম্বা লাফে Peter সেই পোলের মাথায় লাগিয়ে দিলেন লুকিয়ে নিয়ে আসা সবুজ সোনালী আইরিশ পতাকা। যাতে বড় বড় করে লেখা *" erin go bragh "* - Ireland for ever !! ফ্ল্যাগ পোলের চারপাশে তখন তাকে ঘিরে ধরে সুরক্ষিত করছেন অন্য আইরিশ প্রতিযোগীরা। শোরগোল পরে গেছিলো সেই সময়। সমালোচনাও হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু Olympic এর মত এত বড় মঞ্চে পাকাপাকিভাবে রাজনীতি এনে ফেললেন Peter। হ্যাঁ, রাজনীতি। যা এর পরের প্রায় একশ বছর ধরে বারবার ফিরে এসেছে আর জড়িয়ে থেকেছে Olympic আর প্রায় সমস্ত বিশ্বমানের ক্রীড়ামঞ্চে ।

Kathrine Switzer এর গল্পটা আবার অন্যরকম। আবার সেই ১৯৬৭ সালেরই ঘটনা। এবার Boston। Boston Marathon তখন আমেরিকার বেশ হৈ হৈ করা ব্যাপার। দূর দূর থেকে প্রতিযোগীরা আসেন দৌড়োতে। Boston Marathon এর রুল বুকে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই বটে কিন্তু অলিখিত নিয়ম হচ্ছে মেয়েরা ম্যারাথনে দৌড়োতে পারবে না। এ কেবল পুরুষেরই অধিকার। আর এরকম একটা আজব নিয়মের চৌকিদার হলেন জনৈক John Semple। তাকে আড়ালে আবডালে নিন্দুকরা বলে *"Mr Boston Marathon Himself "* !! ব্যক্তিগতভাবে তিনি ভয়ঙ্কর নারীবিদ্বেষী । Kathrine কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি প্রতিযোগিতায় নাম দেবার সময় নিজের পুরো নাম লিখলেন না। লিখলেন "K.V.Switzer" । তারপর প্রতিযোগীদের নম্বর লেখা যে Bib , নিজের এক পুরুষ বন্ধুকে দিয়ে আনিয়ে নিলেন সেটি । এরপর একটা টুপিওয়ালা জ্যাকেট পরে শুরু করলেন দৌড় । প্রথম কয়েক মাইল ভালোই চলছিল। টুপির আড়াল থেকে কেউ বুঝতে পারে নি যে আসলে একটা মেয়ে দৌড়োচ্ছে। বিপত্তিটা বাধলো কিছুক্ষন পরে। মাথা থেকে মুহূর্তের জন্য টুপি সরে যাবার জন্য স্বয়ং Semple এর চোখ পরে যায় তার দিকে।

ধন্য ভদ্রলোকের (যদি অবশ্য তাকে ভদ্রলোক বলা যায় আরকি !) অধ্যবসায় ....লাফিয়ে ট্র্যাক এ নেমে পড়েন তিনি । সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন Kathrine কে। কিন্তু রক্ষাকর্তা হয়ে ছুটে আসেন Kathrine এর ট্রেনার । সাথে বিশালদেহী Tom Millar যিনি কিনা

Kathrine এর সেই সময়ের প্রেমিক। ভবিষ্যতের স্বামী। এই দুজনের চেষ্টায় আর Kathrine এর প্রবল উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হন Semple। Kathrine দৌড় শেষ করেন। প্রমান করেন যে মেয়েদের পক্ষেও পুরো ২৬ মাইল এর ম্যারাথন শেষ করা সম্ভব। প্রতিবাদ করেন বহুকাল ধরে চলে আসা নারীবিদ্বেষের।

খেলার মাঠে প্রতিবাদের কথা উঠলে আমাদের ভারতীয়দের এ সূত্রে অবশ্যই মনে পড়া উচিত ২০০৩ সালের ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের আরেকটা ঘটনা। Wandarers এর ফাইনাল থেকে ভারতের বিদায়ের ঘটনা নয়। তারও বেশ কয়েকদিন আগের কথা। ১০ ই মার্চ। Zimbabwe র রাজধানী Harare র একটা ছোট্ট Cafe তে দেখা করেছিলেন এক শেতাঙ্গ আর এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার ১০ ই মার্চ এর কদিন আগে। Zimbabwe তে তখন Robert Mugabe র সরকার। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ভুরি ভুরি। বিশেষত তথাকথিত land reform এর নামে শ্বেতাঙ্গ জমি মালিকদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে চাষের জমি। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বলতে আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাষ্ট্রের নজরদারিতে খুন জখমের ঘটনা ঘটছে রোজই। আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিবাদ চলছেই। কিন্তু সবথেকে বড় আঘাতটা এলো দেশের ভেতর থেকেই। Harare র সেই ছোট্ট Cafe তে বসে দুজন ছকে ফেললেন পুরো পরিকল্পনাটা। দুজনেই Zimbabwe র জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য। ১০ ই মার্চ Namibia র সাথে Zimbabwe র লীগের ম্যাচ। ঘটনাচক্রে Zimbabwe তে হওয়া প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচ সেটা। কাজেই সারা ক্রিকেটবিশ্বের নজর সেদিকে। সেই ম্যাচে দুজনেই খেললেন কালো Armband পরে। ম্যাচ এর পরে ৪৫০ শব্দে লেখা একটা ছোট্ট কিন্তু ভারী শক্তিশালী প্রেস স্টেটমেন্ট এ সরাসরি বলে দিলেন প্রিয় Zimbabwe তে "Death of democracy" র প্রতিবাদ করছেন তারা। ফলাফল হল মারাত্মক। কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারটি আর মাত্র একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন জীবনে। আর কোনোদিন সুযোগ তো পান ই নি বরং বেশ কিছুদিন প্রাণভয়ে এদিক ওদিকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারটিকে জাতীয় দল থেকে তক্ষুনি বহিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি তর্কাতীতভাবে Zimbabwe র সেই সময়ের এক নম্বর ক্রিকেটার। শুধু তাই নয় তিনি সর্বকালের সেরা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন। নাম Andy Flower !!!! ভাগ্গিস তিনি ওয়ার্ল্ড কাপের আগেই অবসর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। তীব্র রাজনৈতিক চাপ , প্রানভয় , সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়া সব সামলে পরে চলে যান অস্ট্রেলিয়া তে। থাকতে পারেন নি দেশে। Henry Olonga র সাথে Andy Flower এর সেই Black Armband Protest ই বোধহয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মঞ্চে সবথেকে বড় রাজনৈতিক প্রতিবাদ !!!!

প্রতিবাদের ধরণধারণগুলো সবসময় এতো সরাসরি নয়। যেমন ১৯৩৬ সালের Berlin Olympic I জার্মানি তে তখন Nazi Party র রমরমা। দেশের শীর্ষে পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চির প্রজাপতি গোঁফওয়ালা মানুষটা। যুদ্ধ শুরু হতে তখনও তিন তিনটে বছর দেরি। কিন্তু তখন থেকেই গোটা ইউরোপের হাড়ে ভয়ের শিরশিরে হাওয়া লাগাতে শুরু করেছেন তিনি। ১৯৩৩ সালের Nazi Party র সর্বোচ্চ Sports Office এর হুকুমে ইহুদি , কৃষ্ণাঙ্গদের মত "অনার্যদের" জার্মানিতে খেলাধুলো করা মানা। কারণ স্বয়ং হিটলার বিশ্বাস করতেন খেলাধুলোর মত কাজ , যাতে Excellence লাগে , সেসব অনার্যদের কাজ না। এরকম একটা আবহে International Olympic Committee কেন Berlin এ Olympic এর অনুমতি দিলো সেটা আজও রহস্য। অনেক দেশই প্রথমে ভেবেছিলো বার্লিন এ দল পাঠাবে না। তার মধ্যে আমেরিকাও ছিল। কিন্তু পরে মত বদলায় তারা। ভাগ্গিস !!! আঠেরো জন কৃষ্ণাঙ্গ Athlete ছিলেন আমেরিকার দলে। হিটলাররের আর্যপ্রীতির মুখে ঝামা ঘষে চোদ্দটা মেডেল পান শুধু কৃষ্ণাঙ্গরাই। Alabama র অখ্যাত গ্রামের প্রবল দারিদ্রের মধ্যে থেকে উঠে আসা মাঝারি উচ্চতার এক আফ্রিকান আমেরিকান একাই পান চারটে মেডেল। পরে যিনি হবেন পৃথিবীর সর্বকালের সেরা athlete দের মধ্যে একজন। Jesse Ownes !! মেডেল জেতার পরে Jessee র সাথে হিটলারের দেখা হওয়ার গল্পটা নিয়ে বহু গুজব আছে। কেউ বলেন রেগে গিয়ে Hitler নাকি Jessee র সাথে দেখাই করেন নি , কেউ বলেন দূর থেকে কাষ্ঠ হেসে একটা হিটলারি স্যালুট দিয়েছিলেন , আবার কেউ বলেন কাছাকাছি এসেও করমর্দন এড়িয়ে যান ! সে যাই হোক খোদ বার্লিন এ , আর্য সাম্রাজ্যের তথাকথিত সদর শহরে বসে হিটলারের নাকের ডগা দিয়ে সবথেকে বেশি সোনার মেডেল নিয়ে এলেন এক কালো আমেরিকান ! এর থেকে বড় প্রতিবাদ আর কি হতে পারে ??

এ সূত্রে আরেকটা কথা মনে পরে যাচ্ছে। ১৯৬৪ র Tokyo Olympic । যুদ্ধের পরে জাপান আবার আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে। হিরোশিমা নাগাসাকির ক্ষত কাটিয়ে উঠে নতুন এক superpower এর শুরুর দিন সেগুলো। ১০ই অক্টোবর এর Opening Ceremony তে Final Torch Bearer হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল উনিশ বছরের কিশোর Yoshinori Sakai কে। না। নামটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বয়সটা গুরুত্বপূর্ণ। Yoshinori জন্মেছিলো ১৯৪৫ সালের ৬ই অগস্ট ! হ্যাঁ , হিরোশিমাতে বোমা পরে সব শেষ হয়ে যাবার দিন। Yoshinori কে দিয়ে কি বোঝাতে চাইলো জাপান। সরকারি মতে এটা শুধুই শান্তির বাণী। কিন্তু সত্যিই কি তাই ? নতুন করে শুরুর দিন , The Greatest Show on earth এ এটা বোধয় জাপানের subtle প্রতিবাদ !

লিখতে বসলে এরকম ঘটনার শেষ নেই। আটষট্টির Mexico City Olympic এ সারা পৃথিবীর কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে , John Carlos আর Tommy Smith এর Black Power Slaute থেকে শুরু করে প্রায় সেই একই কারণে এই তো সেদিন Naomi Osaka র US Open এ Mask Protest কিংবা এই গতবছরে ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলের জাতীয় সংগীত না গাওয়া সে দেশে ক্রমাগত ঘটে চলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে - সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে !!

কয়েক সপ্তাহ ধরে Jantar Mantar এর একটানা প্রতিবাদ এরকমই একরাশ মুহূর্তের জন্ম দিয়ে চলেছে ক্রমাগত। একটা কথা সোজাসুজি মেনে নেওয়া যাক , এমন জিনিস ভারতে আগে ঘটেনি। ভিনেশ ফোগট , সাক্ষী মালিক , বজরং পুনিয়া রা যে মাপের athelete, তাতে এই আন্দোলন এদ্দিন চলার কথাই না। ছয় বারের সাংসদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ওজন যে এতগুলো সোনা রুপোর মেডেলের থেকে

অনেক অনেক বেশি , গর্বের সঙ্গে রোজ গরম গরম মন্তব্য করে তিনি বুঝিয়েও দিচ্ছেন সেকথা। ইনকোয়ারি চলছে , ব্যবস্থা নেওয়া হবে এরকম ফাঁপা মন্তব্যে শাসকশিবির আর কতটা গুছিয়ে নিতে পারে সেটাই দেখার আপাতত।

তবে হ্যাঁ , হরিদ্বার এ পদক ভাসাতে যাওয়া ভিনেশ, সাক্ষী, বজরং দের থেকে কৃষকসভার, সযত্নে সেগুলো রক্ষা করার দৃশ্যটা কাব্যময় ! আর সেটাই বোধয় ভরসা। Md Ali র কথা, সাক্ষী, ভিনেশ রা নিশ্চই জানেন। Jesse Ownes, Peter O' Conor, Katherine Switzer দের কথা জানেন কিনা জানি না। জানলে বোধয় আর একটু উৎসাহ পেতেন। তবে না জানলেও ক্ষতি কি। সাক্ষী, ভিনেশদের ইতিহাস জানার দায় নেই।

তারা নিজেরাই তো ইতিহাস হতে চলেছেন !!!

দুর্গাপূজো
ধ্রুপদ চ্যাটার্জী
Age-9
Class-5

আহিরী মজুমদার

"বিশ্বকাপের" গল্প

সুদীপ্ত সাহা

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২ জুড়ে কাতারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ২২ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর, যেখানে ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো আর্জেন্টিনা। ১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসে উরুগুয়েতে, যেখানে আয়োজক দেশ উরুগুয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ১৯৭৪ এর আগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দেশকে যে ট্রফিটি দেওয়া হতো তার নাম ছিল জুলে রিমে ট্রফি। রুপোর উপর সোনার মোড়ক দেওয়া গ্রীস দেশের বিজয় এর দেবী নাইকির আকৃতি বেষ্টিত এই ট্রফিটি ঘিরে আছে অনেক রোমহর্ষক ঘটনা। আজ সেরকমই কিছু ঘটনার কথা বলবো।

বস্তুতপক্ষে, ১৯৩০ সালে যখন বিশ্বকাপ শুরু হয় তখন এই ট্রফিটির নাম ছিল "ভিকট্রি", পরবর্তী কালে ১৯৪৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ফিফার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুলে রীমের সম্মানে এই ট্রফির নামকরণ করা হয় জুলে রীমে ট্রফি। মসিয়েঁ জুলে রীমে ফরাসি ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং পরবর্তী কালে ১৯২১ থেকে ১৯৫৪ অবধি ফিফার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বিশ্বকাপের সূচনা হয় - তাই এই সম্মান।

জুলে রীমে ট্রফি

যখন বিশ্বকাপের পরিকল্পনা করা হয় তখন ফিফার পরিচালন কমিটি ঠিক করেন যে দেশ সর্বপ্রথম তিনবার বিশ্বকাপ জয় করবে তাদেরকে ট্রফিটি চিরকালের মতো দিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৩৪ এবং ১৯৩৮ সালে পর পর দুবার বিশ্বকাপ জিতে ইতালি সেই সুযোগের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো কিন্তু এর পর ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যার ফলে ১৯৪২ আর ১৯৪৬ এর বিশ্বকাপ বাতিল করতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তখন ইউরোপ জুড়ে নাৎসি বাহিনীর দাপাদাপি আর অত্যাচার চলছে। তাদের নজর গিয়ে পরে বিশ্বকাপের ট্রফিটির উপর। ১৯৩৮ সালে বিশ্বকাপ জয়ের ফলে ট্রফিটি তখন ইতালির জিম্মায়, ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন সেটিকে রোমের একটি ব্যাংকের লকারে রেখেছিলো। কিন্তু ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ওত্তোরিনো বারেসি বুঝতে পারেন যে নাৎসিদের নজর ট্রফিটির উপর পড়েছে তাই তিনি সেটি কাউকে না জানিয়ে লকার থেকে সরিয়ে ফেলেন এবং নিজের বেডরুমে তাঁর পালঙ্কের নীচে একটি জুতোর বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু নাৎসিদের নজর এড়ানো কি এতই সহজ, তারা গন্ধে গন্ধে পৌঁছে যায় বারেসির এপার্টমেন্টে এবং খানাতল্লাশি শুরু করে। কিন্তু তারা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি যে কাঙ্খিত বস্তুটিকে একটি জুতোর বাক্সের মধ্যে লুকোনো আছে, তাই সেই যাত্রায় ট্রফিটি নাৎসিদের খপ্পর থেকে বেঁচে যায়।

এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় এবং ১৯৫০ সালে আবার বিশ্বকাপ শুরু হয়, কিন্তু সে যাত্রায় ইতালির আর কাপ জেতা হয় না। সেবার ব্রাজিলকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় উরুগুয়ে। বস্তুতপক্ষে, তিন তিন বার বিশ্বজয় করার জন্যে কোনো দেশকে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

১৯৬৬ সাল – সেবার ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসেছিল এই খেলাটির আঁতুড়ঘর ইংল্যান্ডে। আধুনিক ফুটবলের জন্ম এই দেশে হলেও সেই প্রথমবার বিলেতবাসীর সুযোগ হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটির সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করার। বলাই বাহুল্য এই টুর্নামেন্ট ঘিরে ইংল্যান্ডবাসীর উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। দেশ জুড়ে সাজো-সাজো রব পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ঘটনার জন্যে আরেকটু হলেই সমস্ত আয়োজন প্রায় ভেস্তে যেতে বসেছিল। সেটা যে হয়নি তার পুরো কৃতিত্ব প্রাপ্য একটি সারমেয়র।

দিনটি ২০ মার্চ ১৯৬৬, বিশ্বকাপের আসর বসতে তখনও প্রায় চার মাস বাকি, একটি দুর্লভ স্ট্যাম্প শো-এর অংশ হিসেবে ওয়েস্ট মিনিস্টারের মেথডিস্ট সেন্ট্রাল হলে ট্রফিটিরও প্রকাশ্য প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। সিকিউরিটি গার্ড পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে কেউ বা কারা প্রদর্শনী থেকে ট্রফিটি চুরি করে নেয়। এই ঘটনায় বিশ্বের সেরা পুলিশ বাহিনীর তকমা প্রাপ্ত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বহুল সমালোচিত হয়, তাদের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। প্রথমে সিকিউরিটি গার্ডদের উপর সন্দেহ গেলেও পরে বোঝা যায় যে কাজটি বাইরের কারো।

পিকলস

ইতিমধ্যে ১৫,০০০ পাউন্ড মুক্তিপণ দাবী করে একটি চিঠি এসে পৌঁছয় লন্ডনে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে। সেই দাবী মেনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসারেরা চোরের বলা জায়গায় পৌঁছলেও কারোর দেখা পায় না। মোটামুটি এই সময়ে, পিকলস নামে একটি ছোট কুকুর তার মালিকের সাথে লন্ডনের রাস্তায় হাঁটতে যাচ্ছিল, একটি ঝোপের পেছনে খবরের কাগজে মোড়া কিছু একটা সে দেখতে পায়। কাগজের মোড়ক খোলার পর দেখা যায় যে সেটি জুলে রীমে ট্রফি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ও সমগ্র ফুটবল প্রেমীদের। যথাসময়ে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়, ঘটনাচক্রে ইংল্যান্ডই ১৯৬৬ তে জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বিজেতা হয়।

১৯৭০ এর ব্রাজিল ফুটবল টীম

এর পর ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয় ব্রাজিল ও ইতালি। সেই সময় অবধি ব্রাজিল ও ইতালি দুপক্ষই ২ বার করে বিশ্বকাপ জিতেছিল, ইতালি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে এবং ব্রাজিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে, তাই সেবার যে জিতবে সেই দলের তিন বার কাপ জেতা হবে এবং চিরকালের মতো জুলে রীমে ট্রফি তাদের ঘরে উঠবে। সেই প্রথম এই দুটি দল কোনো বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়। মেক্সিকোর এস্তাদিও এজতেকা স্টেডিয়ামের সেই ফাইনালে ব্রাজিলিয়ান সাম্বার ছন্দে কুপোকাত হয় ইতালির ডিফেন্স এবং তারা ১-৪ গোলে পরাজিত হয়। তিন তিন বার বিশ্বজয়ের ফলে ব্রাজিল চিরকালের মতো ঘরে তোলে জুলে রীমে ট্রফি। যদিও পরবর্তী কালে ১৯৮৩ সালে রিও দি জেনেরিওর ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সদর দফতর থেকে সেই ট্রফিটি চুরি যায় যা আজ অবধি আর উদ্ধার করা যায় নি।

একটা কথা বলে এই লেখাটা শেষ করবো - ১৯৬৬ সালে যখন ট্রফিটি চুরি যায় তখন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের কর্তা আব্রাইন তেবেল ব্রিটিশদেরকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন "এ রকমটা ব্রাজিলে কখনই ঘটত না। এমনকি ব্রাজিলিয়ান চোররাও ফুটবল ভালোবাসে এবং কখনই এই অপবিত্র কাজ করবে না।" কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস যে ট্রফিটি চুরি যায় সেই ব্রাজিল থেকেই। আশা করি যে এই ট্রফিটি কোনো একদিন উদ্ধার হবে এবং আবার প্রতিষ্ঠিত হবে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের দফতরে।

This is a Mithila Painting. This particular style of painting belongs to Bihar State. It is a folk painting. This picture depicts "Mother and Motherhood ". The special characteristics of this picture is the work of "Kachni" style. This picture has expressed in the style of Mithila Painting. The painting has been done in handmade paper in acrylic colour.

-*Soma Halder*

দুর্গা পূজার ইতিকথা

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত (কারিগরী কবিয়াল)

বাঙালীর প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজা। সারা বছর আমরা এই চার-পাঁচ দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকি। বাইরে থেকে লোকজন বাড়িতে ফেরে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখাসাক্ষাৎ হয়। সব মিলিয়ে যেন এক মিলনমেলা। কবে, কখন, কোথায় প্রথম দুর্গাপূজো শুরু হয়েছিল--তা সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। কিন্তু, বাঙালীর এই শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানের সূচনা উৎসের সন্ধানে, আমরা যদি আলোকপাত করি, তাহলে দেখব এর মূলত: দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত: পৌরাণিক তথ্য এবং দ্বিতীয়ত: ঐতিহাসিক তথ্য।

এবারে, পৌরাণিক উৎসের সন্ধান করলে দেখব - এই শরৎকাল শাস্ত্রমতে দেবদেবীদের নিদ্রা বা বিশ্রামের সময়। তাই এই সময়ে দেবপূজা উপযুক্ত নয়। কিন্তু, এই সময়েই দেবীর পূজা করতে হয়েছিল। কালিকা পুরাণ ও বৃহৎধর্ম পুরাণ অনুসারে আমরা এই কথা জানতে পারি যে রাম-রাবণের যুদ্ধের জন্য ব্রহ্মাকে দেবীদুর্গার পুজো করতে হয়। আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে আমরা দেখি যে স্বয়ং রাম নিজে দেবীর পুজো করছেন। রাবণের লঙ্কাপুরী ও স্বয়ং রাবণ নিজে দেবী ভদ্রকালী দ্বারা রক্ষিত ছিলেন। তাছাড়া রাবণ যুদ্ধের আগে দেবীর উপাসনা করে দেবীর থেকে এই বর প্রাপ্ত হন যে দেবী যুদ্ধের সময়ে তাঁর রথের সম্মুখে থাকবেন। অর্থাৎ রাবণকে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। তাই রামকেও দেবীর আরাধনা করতে বলা হয়। রাম পুজো করলেও দেবীর দর্শন পেলেন না। তাই বিভীষণের পরামর্শে তিনি ১০৮ পদ্ম দিয়ে দেবীর পুজো করবেন বলে সঙ্কল্প নেন। তাঁর নির্দেশে হনুমান যান দেবীদহে ১০৮ নীলপদ্ম আনতে। ফুল আনার পর রাম পুজো করতে করতে দেখেন যে ১ টি পদ্ম নেই। আসলে দেবী নিজেই রামের পরীক্ষা নেবার জন্য একটি ফুল লুকিয়ে রাখেন। তখন তিনি তাঁর পদ্মসদৃশ চোখ দেবীকে অর্পণ করবেন বলে স্থির করেন। যখনই তিনি এই কাজ করতে যান তখনই দেবী আবির্ভূত হন ও রামকে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ দিয়ে তাঁর অস্ত্রে প্রবেশ করেন। অবশেষে রাম যুদ্ধে জয়ীও হন। এই হল শরৎকালে দেবীর অকালবোধনের কাহিনী। তবে বাল্মিকী রামায়ণে রামের দুর্গা পুজোর এই কাহিনী নেই।

আবার যখন শ্রী শ্রী চন্ডীর পাতায় চোখ রাখি, তখন দেখি, রাজা সুরথের কাহিনী। রাজা সুরথ যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর মন্ত্রী ও কিছু সভাসদ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর রাজত্ব ও সেনাবাহিনী সব নিয়ে নেন। তখন তিনি রাজ্য থেকে চলে এসে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। তখন তাঁর মেধা নামে এক মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। মেধা মুনি রাজাকে তার আশ্রমে নিয়ে যান। এরপর রাজার সঙ্গে একদিন দেখা হয় সমাধি নামে এক বৈশ্যর। তাঁর থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্ররা তাকে বিতাড়িত করেন। সুরথ ও সমাধি দুজনেই মেধা মুনির কাছে তাঁদের মনঃকষ্টের কারন জানতে চাইলে তিনি দেবী মহামায়ার কথা বলেন ও তাদের দেবীর পূজা করতে বলেন। তখন দুজনেই দেবী দুর্গার আরাধনা করেন ও দেবী সুরথকে তাঁর রাজ্য এবং সমাধিকে বোধি দান করেন। এই হল দুর্গাপূজা শুরুর মূল দুই কাহিনী।

তবে অন্যান্য দেবদেবীরাও নানা সময়ে দেবীর পূজা করেন, তাঁর বিবরণ পাই ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণে। সেখান থেকে জানতে পারি যে প্রথম নাকি দুর্গার পূজা করেন কৃষ্ণ। দ্বিতীয়বার পূজা করেন ব্রহ্মা মধু ও কৈটভ নিধনের সময়। তৃতীয়বার দেবীর পূজা করেন শিব, ত্রিপুর নামে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে। আর চতুর্থবার দেবী পূজা করেন ইন্দ্র দুর্বাশা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে। তবে যেহেতু পুরাণ কাহিনী তাই এই নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। আবার মহিষাসুরের অত্যাচারে দেবলোক যখন ব্রহ্মার স্মরণে এসে জানতে পারলেন যে, ব্রহ্মার বরেই মহিষাসুর অপরাজেয়, ত্রিভুবনে কোনও পুরুষ তাকে বধ করতে পারবেন না, তখন সর্বদেবশরীরজতেজপুঞ্জ একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হলেন দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা। সকল দেবতার অস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে দেবী দশভুজা রূপে অবতীর্ণা হলেন। এই হল, দেবীর মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রকাশ কাহিনী।

এবার যদি ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব, কখন, কোথায় প্রথম দুর্গাপূজো শুরু হয়েছিল -- তা সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। এ বিষয়েও কিন্তু নানা মত প্রচলিত। তবে ইতিহাসের পাতা বলছে, ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় দেবীমাতা, ত্রিমস্তক দেবতা এবং পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। সেই প্রেক্ষিতে, দুর্গা, শিবের অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসাবে পূজিতা হতে পারেন। তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপুজোর উল্লেখ আছে।। একাদশ শতকে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'তে দুর্গা-বন্দনার সুত্র পাওয়া যায়। পরবর্তীতে, ১৬১০ সালে কলকাতার বরিশার রায়চৌধুরী পরিবারের হাত ধরেই প্রথম দুর্গাপুজার আয়োজন হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এরপর পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আযোজন করেছিলেন বলে জানা যায়। বৃটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ও দুর্গাপুজো বিশেষ জনজোয়ার সৃষ্টি করেছিল বলে মনে করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারী হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর স্বাধীনতার পর এই পূজা বাংলা এবং বাংলার সীমা ছাড়িয়ে সংস্কৃতি প্রিয় এবং প্রবাসীদের হাত ধরেই ভারতে এবং ভারতের বাইরের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এরপর, ২০২২ সালে, UNESCO র "FESTIVAL WITH CULTURAL HERITAGE" তকমা পেয়ে, আমাদের "দুর্গাপুজো" আজ প্রকৃত অর্থেই "সার্বজনীন" ।।

「日本の伝統的な「花祭り」についての体験－外国人の視点から－」
Dr. Hiya MUKHERJEE （ムカルジー　ヒヤ）

私は2012年から2014年にかけてインド首都のニューデリーにあるネルー大学で、修士課程の勉強を続けていた。この期間中、日本語や日本文学だけでなく、日本文化、日本史、そして日本社会についてさまざまな知識を得た。ネルー大学の日本語教師と教科書のおかげで、日本が豊かな文化遺産と多くの祭りで知られていることを学んだ。特に、日本語教師たちから「花見まつり」、「京都の祇園まつり」、「お盆」、「七夕まつり」、「高山まつり」など、日本国内でよく知られている祭りについて教えてもらった。ただし、2016年に文部科学省の留学生として初めて日本に行き、これらの祭りに加えて、地方の日本では多くの年中行事が行われることを、周りの日本人の友達や教師たちから教えてもらった。その中でも有名な祭りの一つが「花祭り」だった。日本に移動する前までは、「花祭り」という伝統的な祭りが存在し、特に愛知県で祝われていることを全く知らなかった。名古屋大学の文化人類学学部で教えている佐々木先生の「花祭り」に関する授業を受講したことで、初めて700年の歴史を持つ「花祭り」について詳しく知ることができた。

「花祭り」の現場に行く前は、私は外国人であるため、日本の「花祭り」は「花」と関連する祭りだと思っていた。特に春や夏に美しい花々が咲くイベントだと考えていた。しかし、「花祭り」の名前に「花」が含まれていることから、この祭りは「花」と何らかの関係があるのかと想像していた。しかし、実際にはこの祭りは直接的に「花」とは関係がない。日本に住んでいる外国人の多くも、「花祭り」についてあまり知識がないようである。この作品を通じて、なぜ「花祭り」を特に日本で働く外国人や高等教育を受ける外国人に紹介することが重要なのかについて説明したい。この祭りを通じて彼らが日本の農村地域で地元の祭りがどのように祝われているのかを理解し、出生率の低下と高齢化社会の中で、地元の人々がどれだけ熱心に伝統的な「花祭り」を維持し続けているかを知ることができるからである。

この作品を通じて、日本の「花祭り」がどのような行事であり、いつから日本で祝われるようになったのか、この祭りの目的は何なのか、現在日本のどの地域で「花祭り」が行われているのか、そして私自身が「花祭り」をどのように経験したかを説明していきたいと思う。

日本全国の地方では「花祭り」は開催されていない。現在、「花祭り」は特に愛知県の東栄町、豊根村、設楽町などで開催されている。また、「花祭り」の開催時期は毎年11月から1月にかけて各地域で異なる。場所によって開催時期や「花祭り」の祝い方、祭りに登場する鬼の姿や特徴が異なることがある。例えば、愛知県の東栄町では毎年11月上旬に開催される。1976年に「花祭り」は日本国の重要無形民俗文化財に指定されている。「花祭り」の目的について言えば、悪霊を払い除け、神と人々の調和、豊かな五穀の収穫、無病で平和な生活を祈ることがその主な目的である。この祭りは鎌倉時代から代々、親から子、子から孫へと大切に伝えられてきた神事であり、700年にわたる歴史と伝説がある。ただし、時代の変化に伴い「花祭り」の祝い方が変化してきた。最近ではこの祭りが早朝の5時30分頃に始まり、翌日の夜の2時30分まで続くことが一般的であるが、かつては三日間にわたって行われたこともあった。

この「花祭り」の起源について言及すると、夜通し続く「テーホヘ テホヘ」という祭りは、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、熊野の山伏や加賀白山の聖によってこの愛知県の東栄町に伝えられたと言われている。この「花祭り」では特に鬼面を付けて、村の人々が鬼の舞を行う。現場の祭りに参加して踊る前に、村の人々がだいたい一ヶ月間をかけて踊りの練習をしている。「花祭り」の際に主に三つの鬼が現れる。例えば、「榊鬼（さかきおに）」・「山見鬼（やまみおに）」などである。村の人々が鬼の舞に参加するために鬼面を付けている。「榊鬼」についていうと、日本の伝説や神話に登場する存在し、通常、榊鬼は神社や祭りの際に現れ、人々に神聖なものをもたらす存在とされている。彼らは神聖な榊の木（さかきのき）に宿り、神聖な力を備えていると信じられている。そのため、神社の祭りや祭典の際に、榊鬼は神聖な儀式や祈りの一部として登場することがある。そこで、「花祭り」の際に、東栄町の人々が榊鬼の面をかぶり、鬼の舞をして行事を盛り上げている。また、「山見鬼」についていうと、この鬼は、日本の伝説や民話に登場する存在であり、特に山中や森林地帯に住むとされ、しばしば山の守り神や精霊と関連付けられる。この鬼は山や自然の神秘性と結びついており、日本の伝統文化において特別な存在とされている。村に住んでいる人々は、この「花祭り」を祝うことにより、繁栄と健康の祝福がもたらされると信じている。神が天から地上に降りてきて、地元の人々にこれらの祝福を授けるという信念がある。

私は他の日本人のクラスメートと一緒に、「花祭り」の準備に参加した。地方の人々と協力して地元の祭りの準備に積極的に参加することは素晴らしい経験だったと思う。最近、村に住んでいる若い世代の人々が少なくなり、ほとんどが雇用のために都市部に移住している。しかし、彼らはしばしば「花祭り」の

際に自分の家族を連れて村に戻り、自分たちの村の「花祭り」の特徴と長い歴史について、自分の子供たち（次の世代の子）に教えている。私は外国人としてこの祭りを経験した後、地元の人々が私に、日本語で、悪魔が日本の神道の儀式で重要な役割を果たし、祝詞を唱えることによってどのように歓迎されるか、そして悪魔の祝福を受けた後、どのように適切に天国に送られるかを教えてくれたことを幸運に感じた。愛知県または岐阜県に住んでいる人々に、日本の神道の儀式の独自性と日本の神話における悪魔の重要性を理解するために、この古くからの伝統的な地元の祭りを体験することを強くお勧めしたい。

শুভ হোক।

ঈশ্বরকে আমি বিরক্ত করিনা তেমন,
তিনিও আমায় পাত্তা দেননা মোটে।
তাই বলে নেই ধনুকভাঙা পণ,
প্রসাদ তো খাই, যখন যেমন জোটে।

ঈদ বড়দিন কিংবা দুর্গাপুজায়
প্রার্থনাতে একটু দূরেই থাকি,
দরখাস্ত অনেক পড়ে যায়,
আমারটা তাই নিজের কাছে রাখি।

যার পুজো হোক বলি মনে মনে
আল্লাহ গড শিব কালী বা কেষ্ট
মানুষ যেন শুভ'র কথা শোনে,
বুঝুক সবাই মানবতাই শ্রেষ্ঠ।

না ,পড়িনি তেমনভাবে বেদ,
কোরান গীতা বাইবেলও কি জানি?
ধারণা নেই কবে কি আছে নিষেধ,
সবার পেটে সমান খিদে মানি।

বাঁচতে সবার ভালোবাসা লাগে,
লোভ লালসা সবার কাছে পাপ,
যে সব হাতে ভাইয়ের রক্ত লাগে
সেখানে নেই ঈশ্বরী জলছাপ।

এসব মেনেই ঈশ্বরে আমাতে
অলিখিত চুক্তি একটা আছে,
সবাই যখন আনন্দেতে মাতে
ধর্মবিহীন যাই সে ভিড়ের কাছে।

ঈশ্বর তাই থাকুন নিজের কাজে
আমার তোমার সুখ মিলে এক হোক,
সবার শুভ চাইবার দিন আজ
চাই শুধু সবার মঙ্গল হোক।।

যদি এমন হতো,,

যদি এমন হতো?
বয়সখানি কমিয়ে দিয়ে, বছর খানিক পিছিয়ে দিয়ে,
জীবনটাকে সাজিয়ে নিতেম,
নিজের ইচ্ছে মত।
যদি এমন হতো?
অনেক টাকার মালিক আমি,
বাড়ী, গাড়ী ভীষণ দামি,
পড়ছে চোখে যা কিছু তা কিনছি অবিরত।
যদি এমন হতো?
সবার চেয়ে বড় আমি, সবাই আমার অনুগামী,
আমার পানে সবার মাথা, থাকছে অবনত।
যদি এমন হতো?
সকল ইচ্ছা পূরণ হতো, সকল দুঃখ শূন্য হতো,
জীবন শুধুই সুখের হতো, একটি বারের মত।।

শুভজীৎ মুখার্জী

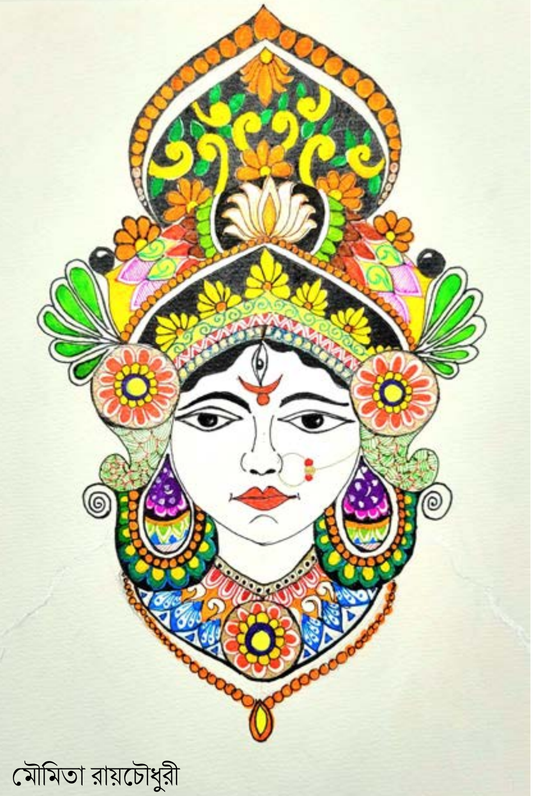
মৌমিতা রায়চৌধুরী

Ikebana in my life

Mahasweta Laskar

It was my second winter in Japan; sustaining alone in a foreign country, the year of 2017 was the tumultuous jolt of mundane living. The jolt was sudden and strong, almost like asphyxiation; all of a sudden, it was the same roads, the same scenery, the same people…, it almost felt that I was on a continuous repeat mode, my past memories flashed of my favourite music screaming again and again on that old Walkman. Loneliness does that! It makes you introspect, and although you don't have enlightenment, you do become a tad bit wiser. So why this life? This life was different and monotonous, and even this little difference mattered. By now, you as a reader, must be wondering where this petty bore story leads to- Hmmm.. Well! why, but of course to the start of continuity and new beginnings…. It was the period of the beginning of Ikebana in my life. I found it finally, or rather it found me. And while I was deeply involved in my daily life, I found an escape that I sought for, a moment I lived deeply, and an experience that rooted me down.

While living in Japan and learning the language, the symbolism of the word "hana" seemed to resonate everywhere; it was the cultural celebrations, markets, temples, the changing seasons, and most importantly not to forget the innumerable depiction of "hana" and natural elements by the distinguished Japanese novelists. Fascinating allure to a such a common species, is it not!

The "Ikebana" word stems out from the two root words "ike" meaning flowing and "bana" meaning hana i.e., flowers. It caught me through the social media platform, and like a curious child I was drawn towards it, shhh….maybe not exactly true,, but somewhere it deeply resonated to the person I am. I was captured by the images, the images of the backdrop of the small quaint town that looked rustic and yet so charmingly beautiful. Ah! I still remember the beautiful willow tree as if flowing in the wind while resolutely standing alone and determined- a perfect visual imagery of a beautiful maiden eternally in wait for her lover as the water of the passing stream looks at her longingly. Seemingly a romantic tragedy, and yes, it weakened me on my knees. I loved every moment of the travel and burden I took to reach this place, and Arimatsu it remains. From the very quiet railway station to the narrow alley adorned with local wares, and all the way up to the community building, every experience was a living breathing moment. The sky was almost like this piercingly blue with small white puffs of smoke of clouds as if in a dreamlike state it was brushed with the bright paints. The few patches of open grounds tantalized itself with wild lilies, while from the distant, the sweet aroma of freshly cooked meal would occasionally divert my mind towards my growling stomach.

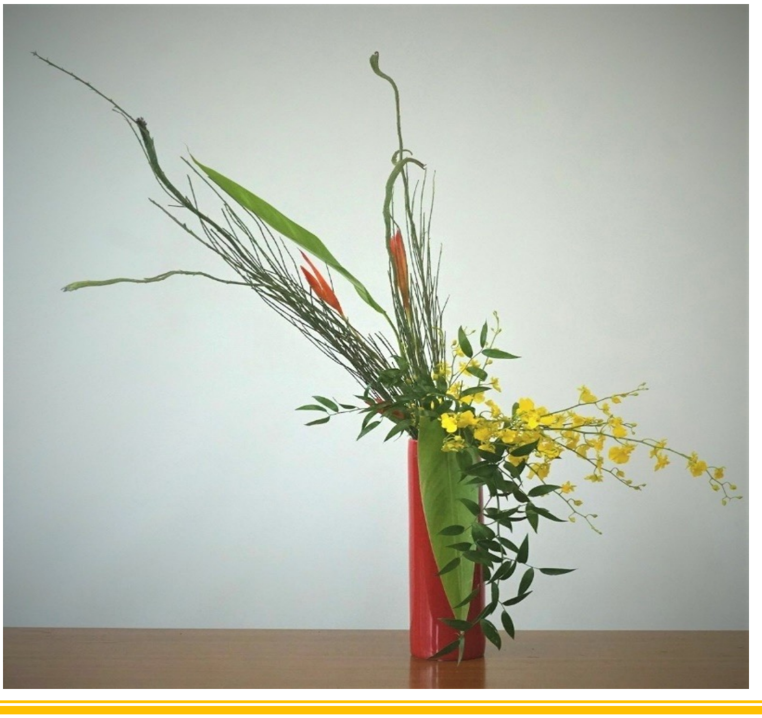

In these morning hours at Arimatsu, many of my emotions were released. The sensory perceptions of the smell, colours, feel of the flowers opened all at once that asphyxiated soul of mine and laid it bare to flow, flow with my own emotions to that of the dainty small fragile thing. And as my movements ceased, I found the essence. It was my obeisance to the heaven, earth and myself as part of the one living existence Shakti, Shakti as the unbeknownst illusory power which is continuously churning, creating and destroying at the same time. The beauty in the marvel of creation, and then of fading away into non-existence is seldom understood. To me, it is a final relief of joy that laughs at beginnings and ends but knows only to

flow, flow together in unison with its surroundings. I still remember the laughing faces of the people who welcomed me in their surroundings, the excitement and dedication to each part of the stem, petal and leaves as they worked on it was spiritually uplifting. My Ikebana Sensei non-judgingly guided and taught each one us to look and seek the beauty into the flawless curves and bends of nature, nature even without its life force, even without its's grandeur. So, what is this part of nature which is so transient, and yet it leaves behind throbbing memories of experience, and why me? This question is hard to put into words, and even more difficult to answer. In short, it resonated. Yes! it resonated to me in all its spirit, in all its wonderment exposing me bare to my own insecurities. And Wow! What a relief it was! To be again belong to that forgotten part of me, well, this was due to me.

শুভঙ্কর রায়

সিংহাসন

সুছন্দ চট্টোপাধ্যায়

রাজা তোর ছায়া কই ?
যেটা দেখালি , সেটা তো তোর সিংহাসনের।
হাজার হাজার বছরের আদিম রিপুর তাড়নায় তৈরী তার ভিত।

প্রথম তোকে দেখেছিলাম বেশ কয়েকদিন আগে।
শুনেছিলাম তোর কাছে মানুষের গান।
দেখেছিলাম তোর ঔদ্ধত্য।

শাসকের চোখে চোখ রেখে কথাবলা।
বলেছিলি সারাজীবন এরকমই থাকবি।
ঠিকটাকে ঠিক বলবি।
ভরসা করেছিলাম।

তারপর কেটে গেছে অনেকটা সময়।
আজ তুই রাজা।
আজ তোকে আবার দেখতে গেলাম।
অনেক দিন পর।
ভাবলাম, তুই হয়তো এখনো তেমনই আছিস।

গিয়ে দেখি, মাটিতে তোর ছায়া নেই।
শুধু সিংহাসনের ছায়া।
রাজারে, সাবধান করে দিই।
আজকের সভায় আগের রাজাকে দেখলি?
ঔদ্ধত্য ছিল কি?

সময় সবের হিসাব করে দেয়।
তাই একবারটি চেষ্টা করে দেখ।
সিংহাসনের ছায়া ছেড়ে নিজের ছায়াটাকে বড় করার।
তুই হয়তো পারবি।
আশায় থাকলাম।

আহিরী মজুমদার

চন্দ্র অভিযান

সুব্রত সেনগুপ্ত

ছোট্টবেলায় ও চাঁদ মামা
দেখতাম তুই অনেক দূরে
বাবার কথায়, মায়ের গানে
থাকতি আমার হৃদয় জুড়ে

তোর দেশেতে ঘুরতে যাব
ভীষণ রকম ইচ্ছা ছিল
তেইশে এসে সত্যি সত্যি
স্বপ্ন আমার পূর্ণ হল

জয় নিশানের তেরঙ্গা আজ
চাঁদের মাটি প্রদিক্ষণে
অনেকদিনের কষ্ট শেষে
স্বপ্নপূরণ চন্দ্রযানে

চাঁদের দেশের জানতে খবর
আমার দেশের বিজ্ঞান
ভীষণ রকম যত্ন দিয়ে
বানিয়েছে আজ প্রজ্ঞান

চাঁদ মামার ওই দাখিন দিকে
আজ বসেছি জমিয়ে ঘাঁটি
জানতে হবে চাঁদের বুকে
ঠিক কতটা জল আর মাটি

ঠিক কতটা বালির পাহাড়
ঠিক কখানা গর্ত
ওখান থেকে কেমন লাগে
দেখতে আমার মর্ত্য

আমার দেশের বিজ্ঞান
আর রত্নগর্ভা বিজ্ঞানীরা
ঝুকিয়ে মাথা প্রণাম জানাই
আনন্দে আজ আত্মহারা

জানি তোমরা করবে সফল
মনের সকল ইচ্ছা
বলবো সেদিন চেঁচিয়ে সবাই
'সারে জাহা সে আচ্ছা '

মা আসছে

সুব্রত সেনগুপ্ত

মায়ের আবার দিবস কিসের
মা তো সবার প্রতিক্ষণে,
মা সে তো এক অনুভূতি
মা তো সবার নাড়ীর টানে।
মায়ের সাথেই অ-আ-ক-খ
মায়ের হাতেই হাঁটতে শেখা,
মায়ের আঁচল সব বরাভয়
মায়ের চোখেই বিশ্ব দেখা।
মায়ের বুকেই নিবীড় ঘুম
আর মা ডাকেতেই পবিত্রতা,
মা গাইলেই গীতবিতান
মায়ের কথাই সঞ্চয়িতা।
মা মানে তো গোর্কির মা সত্যজিতের সর্বজয়া,
মা মানে তো রান্নাঘর আর প্রদীপ হাতে সন্ধ্যে দেওয়া।
সকল বিপদ সামলে এসে মা হাসলেই চাঁদের হাসি,
মা মানে এক আত্মশুদ্ধি স্বর্গাদপি গরিয়সি।

শপথ

সুব্রত সেনগুপ্ত

মন খারাপের বৃষ্টি মানে সন্ধ্যে হওয়া,
মন খারাপের বৃষ্টি হলেই তোমায় চাওয়া।
তোমার খোলা চুলের নেশায় গুমোট আঁধার,
এক পসলা বৃষ্টিতে গায় মেঘমল্লার।
তোমার ঠোঁট আর তোমার গালের আলসেমিতে,
পূর্ণিমা চাঁদ নোয়ায় মাথা মাঝরাতেতে।
তুমি যখন ভালোবাসার গল্প বলো,
সন্ত্রাসবাদ সাদা রঙের পায়রা ওড়ায় অনেকগুলো।
তুমি যখন সোহাগ করে জাপটে ধর,
দুর্নীতি আর মিথ্যা গুলো মুহূর্তে হয় জড়োসড়।
ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ উনিশ সালে,
তবুও কেন রক্তে ভেজা পুলওয়ামা হয় সাত সকালে।
ভালোবাসা আজকে তোমার বিশেষ দিনে শপথ থাকুক,
রক্তে হোলি আর হবে না,
সবুজ ঘাসে সবাই বাঁচুক।

বৃষ্টি পড়ে

অঞ্জন বর্মন

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
আমাদের এই গোপন ঘরে
অক্লান্ত মৃদুস্বরে
বিসর্জনের বাজনা বাজে
হঠাৎ ঝড়ে
প্রত্যাশাতে আগুন ধরে
বৃষ্টি পড়ে...

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
কর্পোরেটের রেলিং ধরে
হাইরাইজে দেদার ঝরে
ফেরার পথে থই থই ঘুম
আঁচল ধরে...

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
রোদ ভরা মুখ উঠোন ভরে
ফুলাঞ্জলি যুক্ত করে
হাত ধরে নেয় আলতো টানে
লজ্জানত চোখের 'পরে
বৃষ্টি পড়ে...

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
শিলার আঘাত ক্ষতস্থলে
ভাঙছে ডানা পঞ্চশরে
অভিমানে ফেরায় না মুখ
চোখের পাতা মৃদু নড়ে
বৃষ্টি পড়ে...

বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে
মহাকালের অসীম স্তরে
শব্দভ্রূণ কোন আখরে
ফুটতে গিয়ে হঠাৎ ঝরে
বৃষ্টি পড়ে..

চিত্রাঙ্গদা কুন্ডু

শুভ বিজয়া

চতুর্থী এলেই দুটো রোগা হাত
এক মাথা তেল চিটচিটে চুল
ইতিহাস পেরিয়ে ভূগোল পেরিয়ে পুজোর গন্ধ নিয়ে
এসে দাঁড়ায় কলকাতায়।

এবারও এসেছিল।

পঞ্চমী গেল, ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল
দেখতে দেখতে পুজো শেষ হল,
কেউ আসেনি।
দুটো হাত কেবল বাজিয়ে গেছে...
ইতিহাস পেরিয়ে ভূগোল পেরিয়ে রাক্ষুসে মাইকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

বছর ভরের খিদে আর মহাকাল সাক্ষী।

দশমীর সন্ধে,
আমি দেখলাম সমস্ত আলো নিভে গেল শহরে।
নিজের মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে
পাঁচ দিনের খিদে পাকস্থলী সে বাজিয়ে চলেছে অবিরাম

পৃথিবীর সমস্ত ক্যামেরা ওর দিকে ফোকাস
টি আর পি চড়চড় করে বাড়ছে

আর আমরা,
মৃত্যুর বাজনা শুনতে শুনতে গোগ্রাসে বিজয়া সেলিব্রেট করছি

রং-বরষে

অ্যাকোয়াটিকার রঙিন জল আর উনিশের ফ্যান্টাসি
বদলে দিয়েছিলো হাঁটুছেঁড়া জিন্সে রবিঠাকুরীও দর্শন
তোমার কোমর থেকে ঠিকরে আসা প্রজাপতি
অন্ধ করে দিয়েছিলো হলুদ চশমার রামকিঙ্করকে

চোখ বুজে একটানা অনেকক্ষণ কবিতা শোনার পর
ফেসবুকে থমকে গেছিলো আগুন রঙের পলাশ

আর এই সবকিছুর মাঝে পা টলতে টলতে
উঃ আন্টে ভা মামা বাঙালি
জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন,
যাদবপুর থেকে জগদ্দল
লাল নীল বেগুলি বাদুরে রঙে চিয়ার্স ছুঁড়ে বললো-
হ্যাপি হোলি

আমি চোখ খুলে দেখলাম ফ্রেম থেকে প্রেমে
নরম রোদ্দুরের মতো তুমি উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে হয়ে যাচ্ছো
আর আমি বার্থোলোমিউ ডিয়াজ

সৈকত ঘোষ

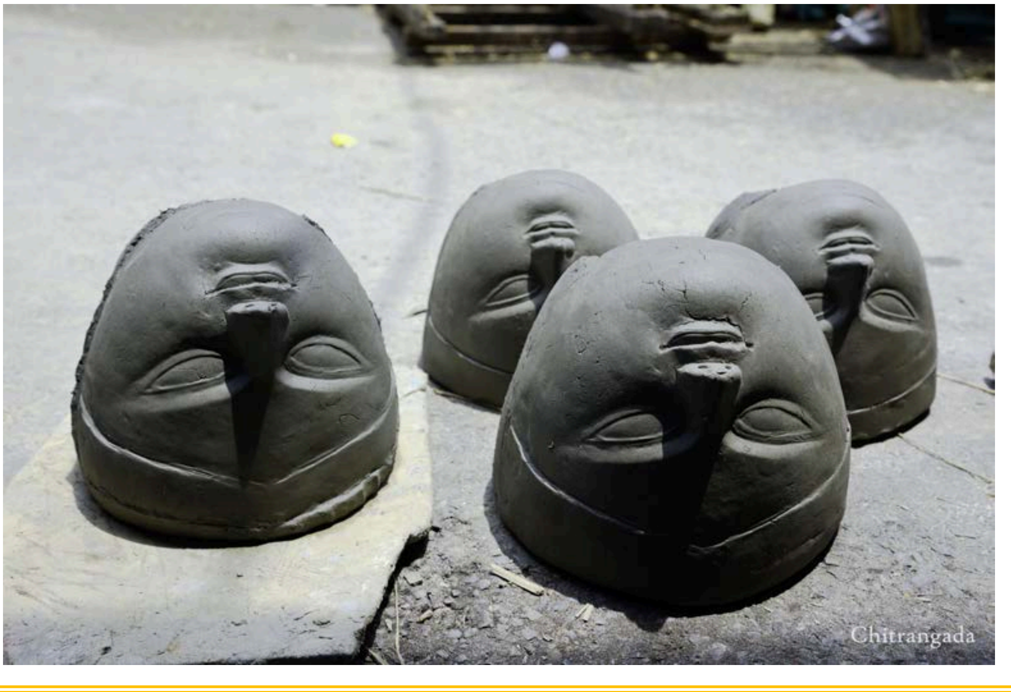

চিত্রাঙ্গদা কুন্ডু

অচিন পাখি

শৌভিক সর্দার

দূরদেশের এক অতিথি পাখি এক শারদ প্রাতে
বাসা বেঁধেছিল একাকী অশ্বত্থ গাছের শাখে।

অঘ্রানের জোছনার রঙে মিশে,
অশ্বত্থ নতুন অতিথির মধ্যে খোঁজে তার প্রিয়াকে।
অচিন পাখির গানের সুরে ছিল ঘর ছাড়ার ব্যথা,
আর অশ্বত্থের মর্মর ধ্বনিতে, শুধুই প্রিয়ার কথা।
সবাই যখন নিদ্রায় মগ্ন, সে শোনাতো তার কবিতা।

শীতের শিশিরভেজা রাতে দুজনের হলো সখ্যতা
বসন্তের মাতাল হাওয়ায় হলো ভালোবাসা।

কিছুকাল পরে,

কালবৈশাখীর শেষে,
একাকী এক মাঝরাতে,
অশ্বত্থ গাছটি শুধায় আপনারে,
'যে পাখি উড়ে যাবেই দূরদেশে
তার প্রেমে কেনো পড়লেম অবশেষে'?

Arrival of Divine Mother

Dr Sudipto Banerjee

Autumn is the year's last loveliest smile
As a second spring with flowers blooming a while.

My very soul deliciously attached to it
Wherein life demands nature's urge to meet.

Every leaf of *Nyctanthes* in lovely weather so glee
It's time to enjoy, life starts all over with spree

The joyful rays of sunshine- like plumes of steam
Fluffy clouds all around as if in a dream.

Arrival of Divine MOTHER- a dynamic retrieval
Symbolizes the triumph of virtuous over evil.

Jovial leaves of Cakins speak bliss to me
Chanting mantras while fluttering from the tree.

Each year, we rediscover the magic of enchanted life
With freedom like a river, Autumn meanders like a "schleife".

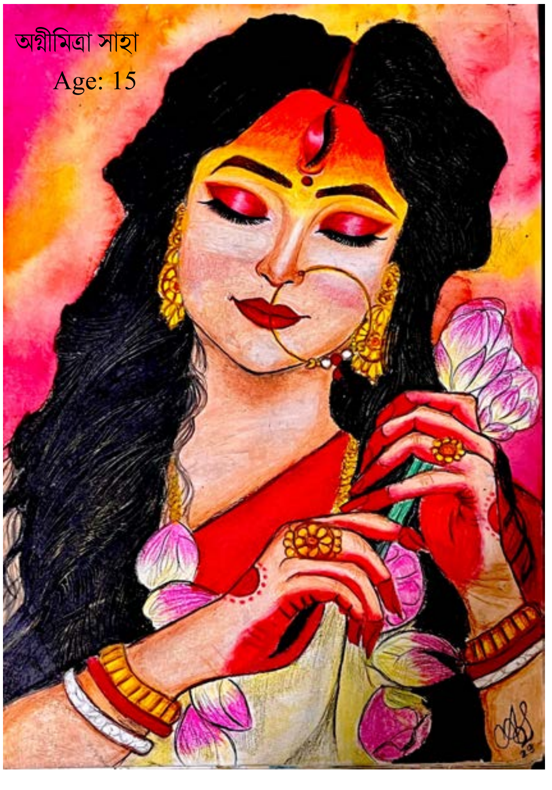

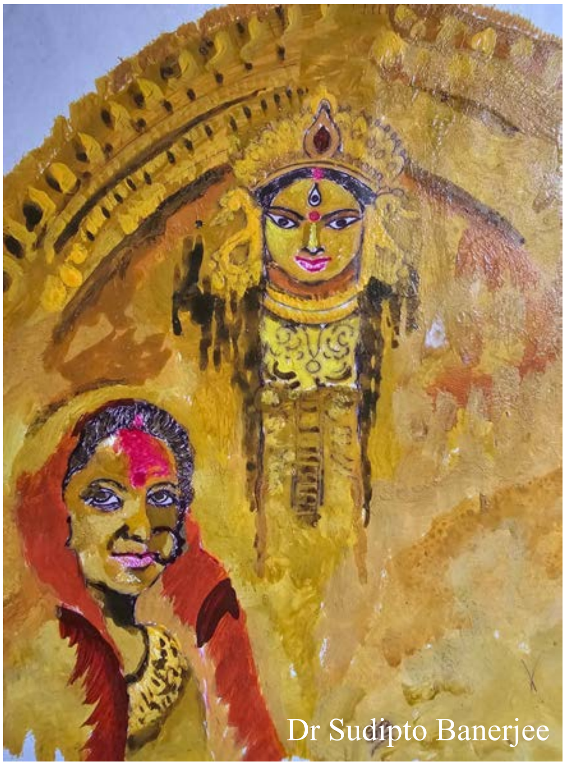

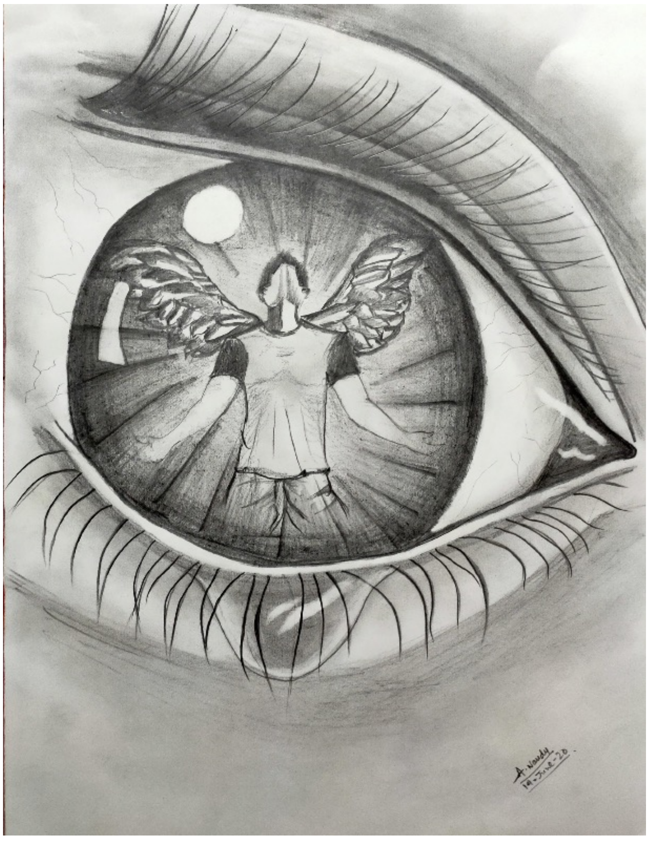

অনির্বান নন্দী

সুকন্যা মিশ্র

I hold the moon in my arms and the stars in your eyes,
I see wonder and magic, creation divine.
Time moves fast, slips right through the cracks
Of space, and lightyears of infinite smiles!

আমার কষ্ট

সুলতানা পারভীন

আমি কষ্ট পাই,আমি খুব
কষ্ট পাই , যখন কারো অকারণ
অকস্মাৎ অপমানে আহত পাখির
মতো চেয়ে থাকে কেউ আমার দিকে।
আমি ব্যাথিত হই যখন কেউ
অনেকগুলো কাঁধে ভর করে
করে ,অনেক উপরে উঠে নিচের
কাঁধগুলো আর চিনতেই পারেনা।
আমার দেহের সব রক্ত শুষে নিতে চাই
সেই দৃশ্য, যে দৃশ্যে একজন বৃদ্ধা মা
আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই ছেলের
হাত, ছেলে ছাড়িয়ে নেয়
পিঠে পড়ে হাজারো বেত্রাঘাত
যখন কোন সুযোগ্য ব্যক্তি
একটি চাকরি ভিক্ষা করে
ফেরে দ্বারে দ্বারে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।
বারবিকিউ এ ঝলসে যায় আমার হৃদয়
যখন শুনি কেউ শেষ করেছে নিজের জীবন,
জীবন তাকে প্রতিবার খালি
হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বলে।
আমার যন্ত্রণাগুলো হাত ধরাধরি
করে দাঁড়িয়ে আমার
পথ রোধ করে, আমাকে আগাতে
দেয়না কিছুতেই।

এক নতুন পৃথিবী

অনুরাগ ঘোষ

কয়েক মাস ধরেই কর্মসূত্রে জাপানে যাওয়ার কথা চলছিল, তাই একটু একটু ভাষা শিখছিলাম, একটু করে মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ভুটান ছাড়া অন্য কোনো দেশে যাওয়া হয়নি। অনেক ছোটোখাটো বাধা-বিপত্তি পেরিয়া অবশেষে 2019 সালের 2রা ফেব্রুয়ারি পাড়ি দিলাম এক নতুন দেশের পথে।

জাপানে এসে দেখলাম এ এক অদ্ভুত দেশ।

দেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিক নিজেই গ্রহণ করেছে। ঝাঁ চকচকে রাস্তা, পরিষ্কার ফুটপাথ, সাদা জুতো বহুদিন ব্যবহার করলেও ব্রাশ করার দরকার পরে না।

বিনয় কাকে বলে জাপানে না আসলে হয়তো অজানা রয়ে যেত। এই ধরুন রাস্তায় চলতে চলতে কোনো কারণে কারুর সাথে ধাক্কা লাগলো, তখন ওই জাপানিই প্রথমে ক্ষমা চাইবে যদিও আমি ভালো করে জানি আমার অসতর্কতায় এটা হয়েছে। অচেনা লোক হলেও মাথা নত করে সম্মান জানানোর সংস্কারটাও বেশ লাগে।

কর্মক্ষেত্রেও এসে দেখলাম অন্য এক ছবি। কি ভয়ানক খাটতে পারে জাপানিরা। বুঝলাম দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে দুটো বোমায় বিদ্ধস্ত হওয়ার পরেও কিভাবে আর্থিক দিক থেকে পৃথিবীতে তিন নম্বর স্থান অধিকার করে নিয়েছে।

ছোটবেলায় টিভিতে প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপুজো উদযাপন দেখেছি, তাই জাপানে এসে IBCAJ সন্ধান পেয়ে উচ্ছসিত হলাম। 2019 এ আমার প্রথম প্রবাসী বাঙালিদের দুর্গাপুজো দেখা। জাপানে নিজেদের কর্মব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির জন্য সময় বার করে এতো সুন্দর আয়োজন করা দেখে পুজো প্রবর্তকদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা অনুভব করলাম।

ধীরে ধীরে আরও অনেক বাঙালিদের সাথে পরিচয় হলো। এখন তো প্রায় প্রত্যেক মাসেই কোথায় না কোথায় একত্রিত হয়ে জমিয়ে আড্ডা মারা হয়।

জাপানি ভাষাটা শিখতে শিখতে মনে হচ্ছে ভারত থেকে এত দূর এই দেশটার মানসিকতা, রীতি রেওয়াজ, সংস্কৃতি আরও যেন বেশি করে বুঝতে পারছি। চেনা পরিচিত বাংলার অলি গলি ছেড়ে ধীরে ধীরে জাপানের এই অপরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার অনুভূতিটা সত্যি রোমাঞ্চকর।

এই নতুন পৃথিবীতে আরও অনেক অভিজ্ঞতার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

এই জাপানেই হয়তো আপনার সাথে একদিন দেখা হবে। ভালো থাকবেন।

অর্পিতা দাশগুপ্ত

শাশ্বত রায়

Tatami bridge
শুভঙ্কর রায়

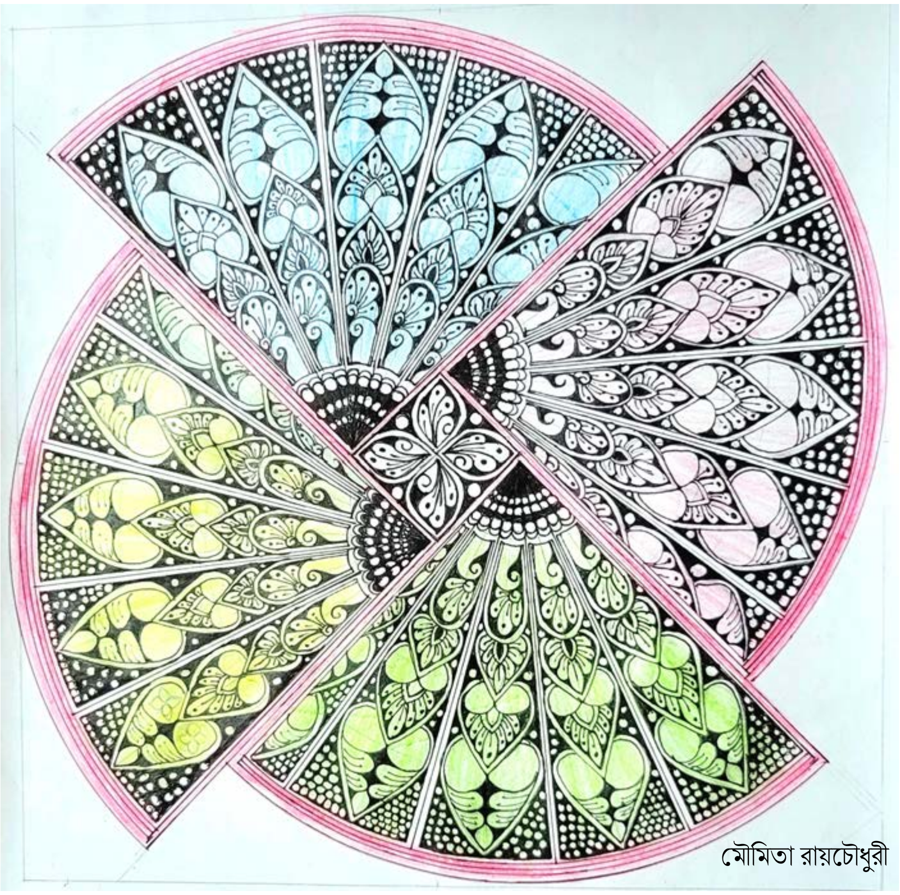
মৌমিতা রায়চৌধুরী

প্রবাহ-সুখ, ঝকঝকে আগুন ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত

প্রত্যূষা সরকার

১।

সেই গল্পে আষাঢ়ে মৈথুন
জ্যান্ত নক্ষত্র, আদি ও অমোঘ প্রশ্রয়

সেই সতর্কতা থেকেই বারবার আমির কাছে গিয়েছি
মন্ত্র-হ্রদ, ঈষদুষ্ণ আশীর্বাদ

এরপর ক্রমসংকেত, খেলতে খেলতে আমিষ ভুলে যাই
সন্ধ্যাতারা। ভূমধ্য-গান। রক্ত। চিতা। সাবানদানি
চোখ মুছে নেয় শান্ত থিয়েস্টিস

২।

উল্টে গেছে জাদুঘর, শবদাগ, আচমন সমাবেশ
যতটুকু তবুও আগলে রাখার
জোড়া আকাশর অপেক্ষায় অবিরত কান্নাদানি

যে মেঘ তাকে বারুদ চিনিয়েছে
শাপশাপান্ত বিগ্রহ, বাড়িঘর
অভ্যেসে বদলেছে দোলনচাঁপা
আবডালে প্রেম বিভাজিকা…

প্রবাসী হাওয়ার দলে এখনও কানে এসে বাজে
দোলনচাঁপার বয়ঃসন্ধিকাল

৩।

তোমাকে পড়বো ভেবে পৃষ্ঠারা চুপচাপ
মধুমেহ, ছায়া নীল জানলা
সন্ধ্যা জুড়েছে যারা, প্রেতসিদ্ধ
দু-হাতে মেদহীন মেধা

এরপরেও সংকেত চেনাবে না কাক
খাক হওয়া স্টিক্স বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ
যাকিছু জলজ ছিলো কামজ মেঘের ঘোরে
সৃষ্টি নেই! টান টান বালিয়াড়ি, চাষাবাদ শূন্য

তোমাকে পড়বো ভেবে জলপাই দেওয়াল তুলি
মশারির ভেতরে সহস্র জিউস

৪।

তোমাকে ছেড়ে এসেছি, ঘুম থেকে দেহান্তর
আগাম অসুখ
যাকিছু তুমিও জানো, প্রেমবোধ আপেক্ষিক
ক্ষোভ তেজ রং ঘর--- মায়াজাল
মেয়াদ ফুরালে কান্না প্রমোহ প্রেমে শশ্মান-যাপন

তোমাকে ছেড়ে এসেছি, ইন্ধনে চাঁদের ঘাম
আগুনে দূষণে দোসর শীত

৫।

উপমা নিয়ে খেলনাবাটি খেলতে খেলতে কবিতা ভুলে গেছে যে নদী, তাকে আর একবার আঘাত করা প্রয়োজন। বৃষ্টিভেজা কোনো এক চিনেবাদাম সন্ধ্যায় বোষ্টমীর অকৃতজ্ঞ হাসির মতো প্রেম প্রাক-প্রহসন এড়িয়ে যাবে, দুর্গন্ধে ম ম নাভি। প্রেমিক সেদিন বেদস্তুর, ত্যাগপত্র সাজিয়ে রেখেছে প্রতিশোধ।

কে যেন আবার কবিতা লিখছে। কে যেন স্থাতব্য করছে সমুদ্রবায়ু।

এই পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, সব মিথ্যে

৬।

হুবহু তুমির মতো আশ্রয়
অশ্বত্থ বন, গিজগিজে টুনিলাইট সন্ধে
সেই তুমি ক্রান্তিয় ঠোঁটের পাশে বসেছিলে, শান্ত
আষাঢ়ে নদীর স্রোত, সোহাগী ত্রিকোণ খাট
মেঝেতে তুমির সাথে পাপ হেঁটে যায়

নিজেকে আংশিক করিনি কখনও
ভরাট ঘুমের কোলে বাঁধিনি অমোঘ নিয়মকলা
হুবহু তুমির মতো বালিশে বিয়োগ টানি
যতদিন ধারাবাহিক, যতদিন নিরাময়

৭|
মেঘ বেয়ে নামছে মন খারাপ
মানচিত্র সরছে, সরে যাচ্ছে ক্রমশ
কপাট খুলে খিলখিলিয়ে হাসছে জোড়-বারান্দা

তোমার মশারিতে আলসেমি লেপতেই
প্রতিবেশী ঘুঘু এসে আয়তক্ষেত্র মাপছে
সমস্ত বৈসাদৃশ্য আলাদা করে নিপুন হাতে টানছে বিষুবরেখা

এ এক বন্য হৃদযাপন
কড়াই ফেঁপে মুশুরি ফ্যানা
বিবাদী রঙের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দলা দলা অন্ধকারে

৮|
বলতে না পারা যুদ্ধের কথায় শ্মশানপোড়া সোহাগ মিশে থাকে। প্রেমিক তখন অঘোর, কাল-অষ্টমীর আসীরীয় সিংহ। প্রেম দরজা ভেঙে দাঁড়ায়, সম্পাদী রং ছড়িয়েছে জঞ্জাল। এতোদিন যেটুকু গোছানো ছিলো, নিষেধাজ্ঞা··· সংযত ঘরদোর।

ঋতুকাল কেটে গেলে মেয়েরা প্রেমিক খোঁজে না আর, ছিঁড়ে ফেলে ভালো থাকার সমস্ত বিজ্ঞাপন।

৯|
এই পর্যন্ত সবটাই স্মৃতিভ্রম। ভাঙাচোরা ঘুমের মধ্যে যেটুকু দেহাবশেষ ছায়া হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

শরীর ছিঁড়ে যায়, অশরীরী দুঃখ-পাগল রাত। আলতাবাটি পায়ে হিমসিম সংসার। ঘর বারান্দা আঁশবটি আগুনে অনেকটা বড় ঘুম··· ঠোঁটের কুচি থেকে একটা একটা করে বিপ্লব নামিয়ে আনে

১০|
গোপনে যে কতটা ব্যর্থ তুমি, আমি জানি। ঝটপট সাবড়ে নাও প্রস্থের শেষ অবধি। অফুরান জন্মস্রোত কিংবা প্রবাহ-সুখ, বিলাসী মেঘের ডানা··· উপকথা! সেইদিকে অবিরত অসুখ। নিমেষে আগুন হতে পারো না? ভোরের যুদ্ধ শেষে নরম প্রপাত লোভ, অতলান্তিক, সাদাকালো দ্বীপ।

কতটা ব্যর্থ তুমি, কতটা প্রবল। কতটা শূন্য হলে বুঝবে, তুমি নিখুঁত প্রতারক!

LUNCH BUFFET
(ALL BRANCHES)

AWARDED BEST RESTAURANT IN JAPAN FOR 6 YEARS CONSECUTIVELY.

Make any occassion special with our large scale booking - Birthday, Marriage, Anniversary, Festivals and more. Ladies Day, every Tuesday. Free Lassi/Mango Lassi for Ladies.

20% OFF

nirvanam

SPECIAL DINNER DISCOUNT COUPON

- Present this coupon at any of our branches to avail the offer
- Cash payments only
- Not valid with any other offer/coupon
- 20% OFF per bill.
- To avail this offer, reservation is required.
- No reservations for Lunch.
- Valid Up to : Dec 31, 2023

Atago
2-5-1 Atago, Tokyo Minato City,
Atago Green Hills 3F
Tokyo 104-6203
Phone: 03-6403-0710

Center Kita
1-1-5 NakagawaChuo
Tsuzuki-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 224-0003
Phone: 045-910-5201

Ariake
3F, TOC Ariake Building
Ariake 3-5-7, Koto-ku
Tokyo 135-0063
Phone: 03-5962-4825

Kamiyacho
2F, Oote Building
Toronomon 3-18-21,
Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Phone: 03-3433-1217

Toranomon
B1F Toranomon
Jitsugyo Kaikan
Toranomon 1-1-20,
MinatoKu Tokyo
105-0001
Phone: 03-5510-7875

Nirvanam Ginza
Ginza 2–4–6,
Velvia-Kan 7
ChuoKu, Tokyo,
104-0061
Phone: 03 6271 0957

Nirvanam Kawagoe
UPLACE 1F, 8-1
Wakitahoncho,
Kawagoe, Saitama
350-1123
Phone: 0492 65 4343

নুলিয়া

অর্চিস্মিতা মিশ্রা

ইউরোপের, অন্ততঃ জার্মানির সেপ্টেম্বরকে বলা চলে 'অতিথি বৃষ্টির মাস'! জুলাইয়ের উসকোখুসকো দুপুরের ঝিমধরা উষ্ণতা আর আগস্টের মাঝ থেকে শেষবিকেলের মধুমালতী হাওয়ায় চুলে এসে আটকে যাওয়া কাঁচা মেপল পাতার আলিম্পন পিছনে ফেলে এসেছে আমার প্রতীক্ষিত 'ঘরে ফেরার মাস'! অবশ্য ঠিক এক বছর আগে এইটিই ছিল 'ঘর ছাড়ার মাস'! এঘর থেকে ওঘর। সেঘর থেকে উঠোন।

উঠোন ডিঙ্গিয়ে কত সবুজ বনানী, কালচে পাহাড়, মেটেরঙ্গা নদী আর নীলচে সমুদ্দুর পেরিয়ে মনপবনের নাও পাড়ি দেয় কম্পাসবিহীন অভিযাত্রায়। পথের শেষ আছে বুঝি? মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বিরহব্যাঞ্জনা থেকে মিলন-ঔৎসুক্য... ঘর ছাড়া আর ঘরে ফেরার চিরন্তন দ্বৈতগানে... পৃথিবীর 'করুণ রঙিন পথ' জুড়ে...

মনে একবার আগমনী বেজে উঠলে আর সে মনে চাবুক লাগায় কার সাধ্যি? অতএব কাজে মন লাগছে না অতি সঙ্গত কারণেই। ঠিক এইরকম ইতিউতি উঁকিঝুঁকি মন নিয়ে সাতপুরনো এক ফোল্ডারে খুঁজে পেলাম বাংলাসাহিত্যের কিছু অগ্রণী লেখকের 'প্রথম সাড়া জাগানো গল্প'-এর একটি সংকলন। এক কাপ বন্যবেরি-সুবাসিত চা নিয়ে নীল-সবুজ জংলা লেপের ওমে পা ডুবিয়ে সূচীপত্রটি দেখতে শুরু করতেই মন পুরো চুপসানো বেলুন! অধিকাংশ গল্পই যে পড়া!

বিমল করের 'আত্মজা' থেকে আবুল বাশারের 'অন্য নকসি'। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক বর্ষার গল্প' থেকে মতি নন্দীর 'বেহুলার ভেলা'। না-পড়া গল্পের চিরুনিতল্লাশিতে মিলল রমাপদ চৌধুরীর 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া'। রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প আমার বিশেষ পড়া নেই- যদিও তাঁর উপন্যাসসমগ্রটি কোন এক রেসাল্ট- উচ্ছ্বাসে বাবামায়ের উপহার এবং কালক্ষেপ না করে ফাঁকিবাজ কন্যাটির আদ্যোপান্ত চেটেপুটে সাবাড়!
গল্পকথনের নিটোল ভঙ্গী এবং ভাষার অকপট সারল্যে ওনার লেখনী বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছিল 'ঠোঙাটুকুও না-পড়ে না-ফেলা' কিশোরী আমার।

যাইহোক, গল্পে ফিরি। সাদামাটা কথকতার ধাঁচে এক নবপরিণীতা বধূর আটপৌরে জীবনের কয়েকটা দিন। কোন চমক বা চটক এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়...

সে ঢেউ দেখেনি কখনো। মধুচন্দ্রিমায় এসে সমুদ্রের বিশালত্বে সে বিস্মিত, পুলকিত। তবু ঢেউয়ের খুব কাছে যেতে তার সশঙ্ক কুণ্ঠা, যেভাবে ফুলশয্যার রাতে অদ্ভুত ভালোলাগা বুকে নিয়েও সদ্যচেনা মানুষটির কাছে সলজ্জ সঙ্কোচটুকু ছিল! সদ্য স্বামীপদপ্রাপ্ত তরুণটি স্ত্রীর কাছে নায়কোচিত বীরত্ব প্রদর্শনের প্রথম সুযোগটি হারাতে নিতান্ত নারাজ... সমুদ্র তো তার কাছে নতুন কিছু নয়! নুলিয়ার সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে একাই সমুদ্রস্নানে নামে সে, আর বেশ নিপুণ দক্ষতায় ঢেউয়ের উপর লাফ আর ঢেউ নামার সময়ে ডুব দিয়ে দিয়ে সরে যেতে থাকে তটরেখা থেকে। কয়েক মুহূর্তের মুগ্ধ গর্বের ঘোর কেটে গেলে তরুণীটি বোঝে যে স্রোতের টানে অসহায় হয়েই স্বামী ভেসে যাচ্ছে অনেক দূরে। দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটে নুলিয়ার হাতে ভারী সোনার বালাদুটো গুঁজে দিয়ে স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর আর্জি জানিয়েই তীব্র মানসিক উত্তেজনায় জ্ঞান হারায় সে!

বালাদুটি তরুণীর কাছেই রেখে জলে ঝাঁপ দিয়ে নুলিয়া বাঁচায় স্বামীটিকে। কিন্তু শ্রান্ত শরীর আর ধ্বস্ত মন নিয়ে হোটেলে ফিরে যাওয়ার সময় সে ভুলে যায় বালা দেওয়ার কথা। না, সে অকৃতজ্ঞ নয়- বারেবারেই তিনভরির বালার দিকে চেয়ে মনে হয় যে প্রিয় মানুষটির প্রাণের কাছে এ অতি তুচ্ছ; কিন্তু ওবাড়িতে যদি কেউ খুব বকে? নতুন সংসারে তার নতুন সখী বড়জায়ের পছন্দের এই বালা দান করে বসলে তার বিষয়বুদ্ধির উপর আর আস্থা থাকবে কারো? তবে কি একজোড়া চুড়ি? এক ভরি তো হবেই, নুলিয়া তার বউকে পরাবে বেশ? কিন্তু দিদির সাধের ডিজাইনের চুড়ি যে- দিদি যে তার বড্ড আদরের! তবে কি আংটি? কিন্তু জামাইবাবু বড় স্নেহ করেন তাকে, যদি হঠাৎ পরে দেখাতে বলেন একদিন? সে বড় অনুচিত হবে! আর নুলিয়াদের কর্তব্যই তো ডুবন্ত মানুষকে বাঁচানো... সরকার থেকে রীতিমতো টাকা পায় যে ওরা?

ফিরে যাওয়ার দিন হোটেল থেকে বাক্সপ্যাঁটরা রিক্সায় তোলার সময় নুলিয়ার সঙ্গে দেখা... মনে বেশ আত্মগ্লানি। কিন্তু এবারো সমস্যা- দশটাকার নোটে যে বটুয়া ভর্তি! অগত্যা এক টাকার একটি নোট দিয়ে বিদায় নেওয়া। নুলিয়াও হাসিমুখে সেলাম জানিয়ে গল্পে শেষ টানে। এখানেই গল্পের শেষ এবং আমার বীক্ষণের শুরু। এই গল্পের মধ্যে অনর্থক ধনী কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ইত্যাদি জটিলতার সন্ধান না করাই শ্রেয়। আনাড়ি আটপৌরে বৌটিকে আর যাই হোক ঠিক শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ ভেবে ওঠা যায়না। তার দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তা হ'ল 'মোহ'... আঁকড়ে রাখার চেষ্টা... আর সেই দোষে কি আমরা সকলেই অল্পবিস্তর দোষী নই?

নিয়তই নিজেদের কাছে চলছে আমাদের মনকে চোখ ঠারার পালা। আত্মবিস্মৃতি। আত্মপ্রবঞ্চনা। নিঃসাড় বস্তু, এমনকি সারহীন সম্পর্কগুলিও টিকিয়ে রাখার কী প্রবল হাস্যকর চেষ্টা! প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায় সমতুল অপরাধ নিজেকে স্তোকবাক্যে বশীভূত করা। আমাদের সকলেরই জীবনে এমন হাজারো নুলিয়ার আনাগোনা। প্রতিটি ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে হয়তো নিজেরই অজান্তে তাকে কোন কথা দেওয়া হয়ে গেছে আর আবার অজান্তেই একা একা এই দর কষাকষির খেলা খেলে চলেছি... বালা থেকে চুরি-আংটি হয়ে শেষকালে একটাকার নোট হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি কোন এক হিসেবী সৈকতে, নুলিয়াদের অপেক্ষায়! নিয়তই নিজেদের কাছে চলছে আমাদের মনকে চোখ

ঠারার পালা। আত্মবিস্মৃতি। আত্মপ্রবঞ্চনা। নিঃসাড় বস্তু, এমনকি সারহীন সম্পর্কগুলিও টিকিয়ে রাখার কী প্রবল হাস্যকর চেষ্টা! প্রতিশ্রুতিভঙ্গের প্রায় সমতুল অপরাধ নিজেকে স্তোকবাক্যে বশীভূত করা। আমাদের সকলেরই জীবনে এমন হাজারো নুলিয়ার আনাগোনা। প্রতিটি ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে হয়তো নিজেরই অজান্তে তাকে কোন কথা দেওয়া হয়ে গেছে আর আবার অজান্তেই একা একা এই দর কষাকষির খেলা খেলে চলেছি... বালা থেকে চুরি-আংটি হয়ে শেষকালে একটাকার নোট হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি কোন এক হিসেবী সৈকতে, নুলিয়াদের অপেক্ষায়!

হয়তো তাদের কেউ ভুলে- যাওয়া কৈশোরসঙ্গিনী।

কেউবা শাওনবেলার দোসর।

রক্তসম্পর্ক অতিক্রম করা কোন প্রিয় অবয়ব।

প্রিয় লেখক। চিত্রকর। প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ শিক্ষকেরা।

এই সকল নুলিয়াদের কাছেই আমাদের ঋণ... হয়তো বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপে, বিবিধ পরিচয়ে... আকাঙ্ক্ষার চৌহদ্দি অনায়াসে পেরিয়েই স্নেহ-প্রেম-শিক্ষা-শিল্প-সৃজন- সাহচর্য- সমমর্মিতায় এই নুলিয়ারা পৃথিবীর উপর আরও একটু আস্থা বাড়িয়ে দিয়েছেন তোমার- আমার।

অন্তর ও সমাজের অন্ধকার সময়ের স্রোত যতদিন গ্রাস করে নিতে চাইবে আমাদের মনন ও চেতনা, ততদিন নিঃসীম শূন্যতার মহামারী পরাস্ত করে আমাদের সুরম্য আশ্রয় সুনিশ্চিত করবেন নতুন কোন নুলিয়া... তাঁরা সংখ্যায় অগণ্য, বহুধাবিস্তৃত তাঁদের ক্ষমতার পরিসর...

তাঁরা যার প্রদীপের দৈত্য, সেই আলাদিন শুভচিন্তক মানুষের অন্তরে লালিত অনির্বাণ আলো...

সত্যে... প্রজ্ঞায়... সুন্দরে...

“যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই;
কোথাও আঘাত ছাড়া- তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।...” (জীবনানন্দ)

দেবরাজ বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণী

BOMBAY BAZAAR RESTAURANT

KAWASAKI BRANCH : FRESH VEGETABLES, ASIAN &INDIAN, SPICES & HALAL FOOD.

Catering Order For All Types Of Get Together Including Birthday Celebration House Parties And Community Functions, Specialist In Veg. And Non Veg. North & South Indian Cuisine As Well Chinese Dishes.

(About 5 mins walk from Kawasaki stations)

Take way OK | Party OK

Open : 11:00 AM - 3:00 PM
5:00PM - 11:00PM

Bombay Bazaar Kawasaki Branch:

10-2 Ogawa-cho,Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa-ken 210-0023. Toyko, Japan. Mob: 0908-562-8059

〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町10-2-1F

09085628059 / 08079497867

হাজারীবাগের আষাঢ়ে গল্প

[লেখার শুরুতেই disclaimer হিসেবে একটা কথা জানিয়ে রাখি। এই কাহিনীতে কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে কোনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রচার না ভেবে গল্পের মজাটা উপভোগ করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।]

মধুমিতা নাগ ঘোষ

আমার দাদামশাই সুধীরচন্দ্র বসুর বাড়ী ছিল তখনকার বিহারের হাজারীবাগ রোডে, যা এখন ঝাড়খণ্ডে পড়ে। আমাদের ঐ বাড়ীটির বিষয়ে একটি গর্বের কথা আছে, যে তার ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। দাদু ছিলেন সুভাষচন্দ্রের চতুর্থ দাদা, যাঁকে ছোট ভাইবোনেরা ডাকতেন 'ন'দা' বলে। দাদু হাজারীবাগ রোডে একটি জমি কিনেছিলেন সম্ভবত ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালে। ১৯৪০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল বিহারের রামগড়ে। দাদুও ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন।

রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর দাদু নেতাজীকে অনুরোধ করেন তাঁর সঙ্গে হাজারীবাগে গিয়ে, তাঁর কেনা জমিতে বাড়ীর ভিতটি যেন গেঁথে দেন। হাজারীবাগ জায়গাটি ছিল, যাকে বলে একেবারে গণ্ডগ্রাম, যদিও ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল খুবই সুন্দর। ছোটনাগপুর মালভূমির উন্মুক্ত, অসমতল প্রান্তর, শাল-পলাশ-অর্জুন গাছের জঙ্গল, বালি ও কাঁকরে ঢাকা পথঘাট ছিল বড়ই মনোরম। ওখানকার কূয়ার জলের এমন গুণ ছিল, যা হজমশক্তি বাড়িয়ে দিত। তখন ওখানে জিনিসপত্রের দামও ছিল খুব সস্তা। তাই কলকাতার অনেক বাঙালী ভদ্রলোকেরা ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারানোর উদ্দেশ্যে এখানে বাড়ি করেছিলেন।

কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময়, আর প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতার অনেক লোকেরা এখানে চলে আসেন ও বাড়ী তৈরী করেন। তখনকার বহু বিশিষ্ট বাঙালী, যেমন, সলিসিটার নৃপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, এম.বি. সরকার, আশুতোষ বসু, ভাগ্যকুলের জমিদার রায় পরিবার, হাওড়া মোটর্সের বসু পরিবার, লাহা পরিবার, ছবির প্রযোজক দেবেন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক বিখ্যাত বাঙালীর বাড়ী ছিল এখানে।বাঙালী তো পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাক না কেন, তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে কখনোই ছাড়তে পারে না। তাই এখানকার বাঙালী পরিবারগুলির প্রচেষ্টায় দুর্গাপুজো শুরু হল। সকলের উৎসাহ ও সাহায্যে তৈরী হল একটি দুর্গাবাড়ী। যে সব বাঙালীদের এখানে বাড়ী ছিল, তাঁরা প্রায় সকলেই পুজোর সময় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলে আসতেন আর তখন সারা বছর ঝিমিয়ে থাকা জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠত।

তবে একটা কথা, হাজারীবাগ রোডে যত বিখ্যাত লোকের বাড়ীই থাকুক না কেন, সেখানে বহুদিন পর্যন্ত ইলেকট্রিক ছিল না। সকলের বাড়ীতেই সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই জ্বলে উঠত হারিকেন লণ্ঠন। তা ছাড়া ছিল হ্যাজাক বাতি বা পেট্রোম্যাক্স, যার আলো দিনের আলোর মতো এত উজ্জ্বল হতো, যে তাকে 'ডে লাইট' বাতিও বলা হতো। তারপর ষাটের দশকে ওখানে ইলেকট্রিক এলেও তার ভোল্টেজ ছিল এতই কম, যে টিউবলাইট তো জ্বলতই না আর তখনকার দিনের যে সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্ব ছিল, তাও জ্বলত টিমটিম করে। এর ফলে যে আলোআঁধারি আর তার সাথে গাছের ছায়া মিলে এক গা ছমছমে প্রায় ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরী হতো তা বলাই বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ছিলেন আমার মায়ের বড় মেশোমশাই। তাঁর ছোট ছেলে, আমাদের গোরামামা, একবার এক অদ্ভুতুড়ে পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। মামা একবার কোনো একটা রাতের ট্রেনে এসে হাজারীবাগ স্টেশনে নেমেছেন। স্টেশন থেকে ধানওয়ার রোডে আমাদের 'প্রভাতী' বাড়ীতে যেতে তখন একটা শর্টকাট্ রাস্তা ছিল। স্টেশন রোডের মাঝামাঝি এলে হাসপাতালের মাঠ পড়তো, সেখান দিয়ে কোণাকুণি হাঁটলে এখানকার প্রধান সড়ক ধানওয়ার রোডে ওঠা যেত।

সেদিন ছিল ফুটফুটে চাঁদনী রাত। গোরামামা তো স্টেশন রোড দিয়ে এসে হাসপাতালের মাঠে নামলেন। মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় হাসপাতালের বাড়ীটা। মাঠ ধরে খানিকটা এগোনোর পর, মামা দেখলেন হাসপাতাল বাড়ীটার সামনে একটা ঘোড়া। কিন্তু একটু পরেই সেটাকে আর দেখতে পেলেন না। কিছুটা এগিয়ে মামা দেখেন ঘোড়াটা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক পা এগোনোর পর আবার সেটা উধাও। মাঠ পেরোতে পেরোতেই মামা মাঝে মাঝে দেখেন ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝে মাঝে সেটা যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বুকটা ভয়ে একটু ধক করে উঠলেও, উনি হনহনিয়ে মাঠ পেরিয়ে ধানওয়ার রোডে এসে উঠলেন। সেখানেই উল্টোদিকে নেপালবাবুর দোকান 'প্রবাসী ভাণ্ডার'। গরমের দিনে নেপালবাবু ও তাঁর ছেলেরা বাইরে খাটিয়া পেতে শুয়েছিলেন। দিদার এই বোনপোটিকে ওখানকার সকলেই মোটামুটি চিনতো। তাঁকে আসতে দেখে নেপালবাবুরা উঠে এলেন। তাঁদের কাছে গোরামামা তাঁর দেখা এই ঘোড়াভূতের বৃত্তান্ত বলতে, তাঁরা হো হো করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার হল এই যে, হাসপাতালের একটা ঘোড়ায় টানা অ্যাম্বুলেন্স ছিল। রাতের বেলা ঘোড়াটাকে হাসপাতাল বাড়ীটার সামনে বেঁধে রাখা হতো। ঘোড়াটার রং ছিল কুচকুচে কালো। ঘোড়াটা ঘাস খেতে খেতে হাসপাতাল বাড়ীর ছায়ার বাইরে এলে চাঁদের আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছিল। যখন সে বাড়ীটার ছায়ার দিকে সরে যাচ্ছিল, তখন কালো ছায়ায় তার কালো রং মিশে গিয়ে সে যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। খানিক গল্পগুজবের পর, গোরামামা যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়াচ্ছেন, তখন নেপালবাবুদের ওদেশীয় পরিচারকটি একটু মুচকি হেসে বলল, "বাবু, সাম্‌নে সন্নাটা হ্যায়।" গোরামামার এই ঘোড়াভূতের গল্প আমাদের বাড়ীর সান্ধ্য আড্ডার একটা মজার খোরাক হয়ে রইল চিরদিন।

সে সময় টেলিভিশন, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন -- এসব ছিল সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফিরে এসে প্রায় সকলের বাড়ীতেই বসত গল্পের আসর --- যার বেশীর ভাগই হতো অলৌকিক বা ভৌতিক। আমার দিদা শান্তিলতা বসুর ঠাকুর্দা প্রসন্নকুমার পাল ছিলেন

দেবস্মিতা বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণী

থিয়সফিকাল সোসাইটির সদস্য। ঐ সংস্থার পত্রিকা নিয়মিত গিয়ে পৌঁছত মুঙ্গেরের নিকটবর্তী এক প্রত্যন্ত গ্রাম 'হাভেলী খড়কপুরে' তাঁর বাড়ীতে। এই পত্রিকার মারফত নানান অতীন্দ্রিয় ঘটনার কথা দিদারও পড়া ছিল। তাঁর নিজেরও দু-একটি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি "প্ল্যাঞ্চেট" করায় দক্ষ ছিলেন, আত্মাকে নামিয়ে তার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারতেন। এ থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে দিদা ছিলেন ভূতের গল্পের এক সোনার খনি। তার ওপর হাজারীবাগ জায়গাটাতেও নানা ধরণের অলৌকিক ঘটনা ঘটত, যার কোনো রকম ব্যাখ্যাই করা যেত না। এই সব ঘটনার দু-একটি বলি।

ধানওয়ার রোডের ওপর, স্টেশন থেকে প্রায় তিন--সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে 'হিল ভিউ' নামে একটি বাড়ী ছিল। এখান থেকে গিরিডি ও পরেশনাথ পাহাড় দেখা যেত বলে হয়তো বাড়ীর ঐ নাম। একবার পুজোর আগে, আগস্ট -- সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ এক ভদ্রলোক ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে সপরিবারে থাকতে এলেন। তার কিছুদিন আগেই ভদ্রলোকের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন হয়েছিল। শরীর সারানোর উদ্দেশ্যেই তাঁদের ওখানে যাওয়া। তা এখানকার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া তাঁকে দ্রুত আরোগ্যের পথে নিয়ে গেল। তিনি এতই এনার্জি পেলেন যে মালীর সাইকেল নিয়ে রোজ সেই তিন কিলোমিটার দূরে বাজারে যেতেন, দড়িতে বাঁধা বালতি করে কূয়া থেকে জল তুলে স্নান করতেন। এই সব কাণ্ডকারখানা করতে করতে কিছু দিন পরে তাঁর অপারেশনের সেলাই পেকে উঠল আর অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল। আগেই বলেছি এই জায়গাটি ছিল প্রায় গণ্ডগ্রাম। সুতরাং একটা হাসপাতাল সেখানে থাকলেও, চিকিৎসার খুব সুবন্দোবস্ত ছিল না। ফলে, ভদ্রলোক দু-এক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই তাঁর পরিবারের যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন। বাড়ী আবার আগের মতো বন্ধই রইল।

এর পর ডিসেম্বর মাসে, বড়দিনের ছুটিতে, ঐ বাড়ী যাঁদের, তাঁরা এলেন। রাতে সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ ভোর চারটের সময় কূয়াতলায় জল তোলার আর হুড়হুড় করে জল ঢেলে চান করার শব্দ শোনা যেতে লাগল। ডিসেম্বর মাসে রাত চারটেয় তো অন্ধকার আর প্রচণ্ড হাড়কাঁপানো শীত। এর মধ্যে চান করে কে ? তারপর শোনা গেল গেট খোলার আওয়াজ আর সাইকেলের ঘন্টি। ব্যাপার কি ? বেলা হতে সবাই মালীকে ধরল। তখন মালী বলল যে ঐ ভাড়াটে ভদ্রলোক মারা যাওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন ভোর চারটেয়, যে সময় উনি কূয়া থেকে জল তুলে স্নান করতেন, তারপর সাইকেল নিয়ে বাজারের দিকে যেতেন, সেই শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওঁরা তখন সেই ভদ্রলোকের মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধশান্তি করলেন আর ওখান থেকে গয়া তো কাছেই, সেখানে গিয়ে পিণ্ডদান করলেন। শোনা যায়, তার পরে নাকি ভোররাত্তিরের ঐ ভূতুড়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।

আমার মা ও দিদার একবার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হাজারীবাগে যখন ইলেকট্রিক ছিল না, তখন গরমকালের রাতে দিদারা ছাদে তক্তপোশ পেতে বিছানা করে, মশারি খাটিয়ে ঘুমোতেন। একদিন রাত্রে মা উঠে বাথরুমে গেছেন আর দিদা উঠে ছাদের আলসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ছাদের ঐখান থেকে পাশের 'চারু ভিলা' বাড়ীর থামওয়ালা বারান্দাটা দেখতে পাওয়া যেত। দিদা দেখতে পেলেন থামের গায়ে ঠেস দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তার ধুতির কোঁচা হাওয়ায় উড়ছে। তখন ছিল শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো এক রাত। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক, যেন জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। সুতরাং দেখার কোনোই অসুবিধা ছিল না। মা-ও বাথরুমের জানালা দিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখেন। মা বাথরুম থেকে ফিরলে দিদা বললেন যে বোধ হয় প্রশান্তবাবু এসেছেন। 'চারু ভিলা'-র তখনকার মালিক ছিলেন প্রশান্তবাবু। সে সময় হাওড়া থেকে বম্বে মেল ও দিল্লী-কাল্কা মেল মাঝরাতে হাজারীবাগ পৌঁছত। অনেকেই অফিস করে ঐ সব ট্রেন ধরে এখানে আসতেন। দিদারা ভাবলেন হয়তো তাঁদের প্রতিবেশীটিও এই রাতের ট্রেনে একাই এসেছেন।

এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ভাতটাত খাবার মতো কোনো হোটেল বলতে তখন কিছুই ছিল না। তাই অগত্যা মালী-কাম-কেয়ার টেকার যা পারে তাই দুটো ফুটিয়ে দিত। ওখানে কোনো বাড়ীতে পুরুষমানুষ একা এলে, আশপাশের বাড়ীর গিন্নীরা তার খাবার দায়িত্ব নিজেরাই নিতেন। দিদা মাকে বললেন, "প্রশান্তবাবু একাই এসেছেন মনে হচ্ছে। কাল সকালে ওঁকে বলে পাঠাবো, আমাদের কাছেই খাওয়াদাওয়া করবেন।" পরের দিন সকালে দিদা মালীর হাতে চিঠি দিয়ে প্রশান্তবাবুকে খাবার নিমন্ত্রণ পাঠালেন। মালী পাশের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে বলল, "বাবু তো আসেননি। আপনি চোর-টোর কাউকে দেখেননি তো ?"

দিদার মনে একটু খটকা লাগল। এমনিতে ওখানের স্থানীয়

লোকেরা গরীব হলেও খুবই সৎ। চুরিচামারি বড় একটা হয়ই না। আর একটা কথা, চোর হলেও তো সে ওখানকার কোনো লোকই হবে। সে ওখানকার লোকেদের মতোই আটহাতি, মিলের কোরা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরবে। দিদা আর মা তো দেখেছিলেন কোরা নয়, সাদা ধুতির কোঁচা হাওয়ায় উড়ছে। শহুরে মানুষদেরই তখন তা পরতে দেখা যেত।

এর দিন সাতেক পরে পাশের ঐ 'চারু ভিলা' বাড়ীর মালী একটা পোস্ট কার্ডের চিঠি দিদার কাছে পড়াতে নিয়ে এল। দিদা তো সেই চিঠি পড়ে থ'! প্রশান্তবাবুর ছেলে মালীকে লিখছে যে, যেদিন রাতে দিদা ঐ বাড়ীর বারান্দায় কাউকে দেখেছিলেন, সেইদিনই রাত আড়াইটা নাগাদ প্রশান্তবাবুর হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে। তবে কি প্রশান্তবাবুর আত্মা দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর প্রিয় বাড়ীটি দেখতে এসেছিলেন ?

নন্দলাল বসু একবার শান্তিনিকেতনের কলাভবনের গ্রীষ্মের ছুটিতে হাজারীবাগে গেছেন। আমার দাদু ছিলেন দারুণ আমুদে মানুষ। তিনি ঠিক করলেন ওঁরা সবাই একদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে "মুনলাইট পিকনিক" করবেন। সেই মতো শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার কাছাকাছি একদিন একটু বেলা পড়লে, প্রায় সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ সকলে মিলে তিন-চারটি গরুর গাড়ী চড়ে রওনা হলেন।

আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় আট-নয় কিলোমিটার দূরে বরাকর ও খেড়ুয়া নদীর একটি মোহনা ছিল, যাকে "দোমোহানী" বলা হতো। চারিপাশে বাঁশবন, তার মাঝে বয়ে চলা নদীর দৃশ্য ছিল বড়ই মনোরম। ওঁরা সেই দোমোহানীতেই চললেন পিকনিক করতে। সঙ্গে নেওয়া হল, আলুর দম; মাংসের কারি; ও মিষ্টি। ওখানে গিয়ে চা বানানো হবে আর লুচি ভেজে খাওয়া হবে।

নন্দলাল বসু ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটতে ভালবাসতেন। শান্তিনিকেতন থেকে সুরুল, শ্রীনিকেতন ও আরো সব জায়গা হেঁটেই চলে যেতেন। উনি ওখানে ঐ বাঁশবন দেখে খুব খুশি হলেন। দাদুর যে মালী ছিল শুক্‌রা, তাকে ডেকে উনি বললেন সরু দেখে এক গোছা বাঁশ কাটতে, যা দিয়ে সুন্দর ছড়ি বানানো যাবে। শুক্‌রা মালী তাঁর কথা মতো এক গোছা সরু সরু বাঁশ কেটে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে গুছিয়ে রাখলো।

এর পর চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় বসে সকলে গানটান গাইলেন। তারপর খাওয়াদাওয়া হল। যখন প্রায় ন'টা বাজে, তখন সব জিনিসপত্র গুছিয়ে গরুর গাড়ীতে তুলে সকলে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। গরুর গাড়ীর একটা মজা হচ্ছে, ফেরার পথে তাদের বড় একটা চালনা করতে হয় না, বাড়ীর পথ তাদের চেনা বলে তারা দিব্যি নিজে নিজেই চলতে থাকে। গাড়ীগুলো একটার পর একটা সার বেঁধে চলেছে। এ গাড়ী ও গাড়ীর মধ্যে চেঁচিয়ে কথাবার্তা চলছে, হঠাৎ ওঁরা দেখেন সেই পিকনিকের জায়গাতেই আবার এসে পৌঁছেছেন। মাটি খুঁড়ে যে উনুন করা হয়েছিল, তাতে এখনও কাঠ জ্বলছে।

প্রথম গাড়ীর গাড়োয়ানকে দাদু একটু বকাবকি করলেন, "দেখে চালাচ্ছো না ?" গাড়োয়ানরাও অবাক। গরুরা তো নিজেরাই বাড়ীর পথে চলে, তাদের তো কখনো পথ ভুল হয় না ! যাই হোক, আবার চলা শুরু হল, কিন্তু আধ ঘন্টাটাক পরে দেখা গেল তাঁরা আবার সেইখানেই এসে পৌঁছেছেন। চুল্লীর আগুন আর একটু নিভে এসেছে।

এবার সকলেই একটু নড়েচড়ে বসলেন। হাসাহাসি, গল্প-আড্ডার হালকা মেজাজটা কিছুটা থমকে গেল। এবার গাড়োয়ানরাও একটু যেন ভয় পেয়ে গেল। চাঁদের আলোয় পথ তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তাহলে এমনটা ঘটার কারণ কি ? এত সতর্কতা সত্ত্বেও আবার তৃতীয়বার গাড়ীগুলো সেইখানেই এসে পৌঁছলো। সকলেই এবার একটু ভীত আর চিন্তিত হলেন। এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা !

যাই হোক, আবার চলা শুরু। এবার খানিকটা যাবার পর প্রথম গরুর গাড়ীটার চাকা একটা নাবাল মতো জায়গায় আটকে গেল। শুক্‌রা মালী নন্দলাল বসুর ছড়ির বাণ্ডিল কাঁধে নিয়ে গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটছিল। সে তখন ছড়ির বোঝা নামিয়ে গাড়ীটা ঠেলে তুলতে সাহায্য করতে গেল। প্রথম গাড়ীটা বেরোনোর পর, তার পিছন পিছন অন্য গাড়ীগুলিও এগিয়ে গেল।

খানিক দূর এসে শুক্‌রা বলল, "ঐ যাঃ, বাবুর ছড়ির বাণ্ডিলটা যে ফেলে এলাম, যাই নিয়ে আসি।" তা শুনে দিদা তখন বললেন, "আর ঐ ভূতুড়ে বাঁশ এনে কাজ নেই।" যাই হোক, দিদার কথাই ঠিক হল। আর একটু গিয়েই গাড়ীগুলি আমাদের বাড়ীর রাস্তা ধানওয়ার রোডে উঠে পড়ল। এবার আর গরুদের দিক্ ভুল হল না। হয়তো ঐ বাঁশবনের কোনো ভুলো ভূত ধরেছিল দিদাদের। মাঠের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাজেহাল করে মারতো।

এই রকম নানান রোমাঞ্চকর গল্প আমরা 'প্রভাতী' বাড়ীর ছাদে সন্ধ্যাবেলা তারায় ভরা আকাশের নীচে বসে শুনতাম। হাজারীবাগের সেই আলোছায়ার খেলা ও সুগম্ভীর নির্জনতা ছিল বড়ই রহস্যে ঘেরা। এই শোনা গল্পগুলোয় যেন এক অজানার স্বাদ পেতাম আমরা। তার খোঁজ কি এই আলোকোজ্জ্বল শহরের ড্রয়িংরুমে পাওয়া যায় ?

With best compliments from

Kawasaki-Rikuso Transportation Co., Ltd.

Kawasaki Daiichi Bldg. 3-22-1 Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105-0004, Japan
TEL: 03-3434-7214, FAX: 03-5473-0152
E-MAIL: SGB00033@nifty.ne.jp

ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MARKET

BONGO BAZAR】

HALAL & SUPER MART

3-208-1 Hikonari Misato-city, Saitama.

Open Every day:10:00～20:00

The Haunted Hotel

Ujaan Majumder (Class V)

Raj and Priya were a young couple who loved to travel and explore new places. They decided to spend their honeymoon in a beautiful hill station in the north of India. They booked a room in a hotel that looked charming and cozy in the pictures.

They arrived at the hotel and checked in. The receptionist gave them the key to their room and said, “Welcome to our hotel. We hope you enjoy your stay. Just one thing, please don’t go to the fourth floor. It is off-limits for guests.”

Raj and Priya wondered why the fourth floor was off-limits, but they didn’t ask. They took their luggage and went to their room on the third floor. Their room was spacious and comfortable, with a king-sized bed, a sofa, and a balcony. They unpacked their things and relaxed for a while.

They decided to go out for dinner and explore the town. They left their room and walked towards the elevator. As they were waiting for the elevator, they noticed a sign on the wall that said, “Fourth Floor: Do not Enter.” They looked at each other and felt curious. What was on the fourth floor? Why was it forbidden? They decided to find out.

They pressed the button for the fourth floor and entered the elevator. The elevator went up and stopped at the fourth floor. The doors opened and they stepped out. They saw a long corridor with many doors on either side. The corridor was dark and silent, with no lights or sounds. They felt a cold breeze on their faces and shivered. They walked along the corridor and tried to open some of the doors. They were all locked.

They reached the end of the corridor and saw a door that had a sign that said ,”Room 404: Do not Disturb. They felt a strange attraction to the door. They wanted to see what was inside. They tried to open the door, but it was locked too. They looked around and saw a key hanging on a hook next to the door.

They took the key and inserted it in the lock. The door opened with a creak. They entered the room and saw a bed, a dresser, a mirror, and a window. The room looked normal, except for one thing.

There was blood on the walls.

They gasped and backed away from the door. They heard a voice behind them say, “Hello, welcome to my room.” They turned around and saw a woman standing in front of them. She was wearing a white dress that was stained with blood. She had long black hair that covered her face. She had no eyes, only dark holes where there should be. She smiled and said, ”I’ve been waiting for you”. Raj and Priya screamed and ran towards the door. But it was too late. The door slammed shut and locked itself. They banged on the door and shouted for help. But no one heard them.

No one ever heard from them again.

Sambhavi Solanki

जापान वाला भारत याद आता है
Khusi Verma

भारत की बोली, उमर, राज्य, धर्म लगता है Diverse,
जापान में जाना, हम एकजुट हैं in Universe,

गहने, मेहँदी, योगा, खाना और सुन्दर लाल साड़ी लपेटे
हमारी महिलाएँ रहती हैं टोक्यो में संस्कृति समेटे

भारत की शान को दुनिया तक पहुंचाते हुए
भारतीय लड़के धूम मचा रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कौशल बढ़ाते हुए

होली, दिवाली, सकुरा, ताकायामा, तीज त्यौहार,
हर दिन यहाँ बने परिवारो के साथ खुशियों की बहार

2019 की तस्वीरें देख के दिल भर आता है
आज भी मुझे जापान वाला भारत याद आता है

Japan Evisu
EVISU
Trading Co., Ltd.
日本ゑびす通商株式会社
Japan Evisu Trading Co., Ltd.

ADDRESS: 2 F Sankobiru 2-5-4
Haramachida,Machida-shi,
Tokyo-to 194-0013 Japan.

টেলিফোন

রীনা রায়

বহুদিন কথা হয়না তাদের!

তারা থাকে এক ছাদের তলায় ... পাশাপাশি ... কাছাকাছি, তবু কথা হয়না।

না ভুল বলা হল। কথা যে একেবারেই হয়না তা কিন্তু নয়।

ছেলেটি সকালে অফিস যাবার আগে মেয়েটিকে বলে, 'তাড়াতাড়ি খেতে দাও, আজ একটা জরুরি মিটিং আছে '! কখনও বলে, 'আজ ফিরতে দেরী হবে, ঋককে তুমি টিউশন থেকে নিয়ে এসো।' এভাবেই মেয়েটিও কখনো বাবা মার বয়সজনিত অসুস্থতার কথা, কখনো ছেলের স্কুল বা পড়াশোনার কথা, কখনো সামাজিক কর্তব্য পালনের কথা বলে।

হয়না তাদের মনের কথা বলা, জানা হয়না সকালে উঠে আকাশটাকে মেঘলা দেখে কোন গানটা গাইতে ইচ্ছে হয়, অথবা তাদের এক চিলতে ব্যালকনিতে সেই অদ্ভুত সুন্দর নীল সবুজ পাখিটাকে বসে থাকতে দেখে তার এখনো পাখি হয়ে আকাশে ডানা মেলতে ইচ্ছে করে কি না!

মেয়েটি হঠাৎ আজ পুরনো দিনে ফিরে গেল। বিয়ের আগে সেই দিনগুলোয়, যখন তারা শুধু নিজেদের কথা বলতো, ভালবাসার কথা, ভাললাগার কথা, একলা দেখা স্বপ্নের কথা ...। তবে কি মাত্র এই কটা বছরে তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শেষ? পরস্পরকে জানা বোঝার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই?

মেয়েটির হঠাৎ ছেলেটির জন্য খুব কষ্ট হতে লাগলো। সে ঠিক করলো ছেলেটি বাড়ি ফিরলে আজ সে সেই অনেক আগের মেয়েটি হয়ে যাবে! বিকেল হতেই আজ মেয়েটি খুব সুন্দর করে নিজেকে সাজালো। ছেলেটির পছন্দের লাল রঙের একটা শাড়ি আলমারি থেকে বের করে পড়লো। লাল শাড়ি, লাল ব্লাউজ, কপালে লাল টিপ আর খোঁপায় দিল ছেলেটির পছন্দের হলুদ গোলাপ ... সে ছেলেটির ঘরে ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলো!

***

ক্রিং...... ক্রিং.... ক্রিং

"এটা কি ইমন সেনের বাড়ি?"

'হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন? '

"আমি সাব ইনেস্পক্টর রণজয় বাসু বলছি...... "

'আমি তিথি...... তিথি সেন। ইমন আমার স্বামী..... '

"আপনাকে একটা সংবাদ জানাতেই ফোন করছি। কিছুক্ষণ আগে আপনার স্বামীর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়। আমরা ওনাকে 'শরদিন্দু স্মৃতি মেমোরিয়াল হাসপাতাল' এ অ্যাডমিট করেছি, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন "।

তিথি প্রথমে কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইলো ...ওর মাথা কাজ করছিল না ...

'অ্যাকসিডেন্ট ! ... ইমনের ! ... ইমন হসপিটালে ! ... ওকে যেতে হবে ... ইমনের কাছে ...ঘরের দরজা খোলা রইলো, ও দৌড়তে লাগল ! লাল শাড়ির আঁচল ধুলোয় লুটোলো, হলুদ গোলাপ খোঁপা থেকে খসে পড়ল, ও প্রাণপণে দৌড়তে লাগল !

ইমন, আমাদের সব কথা শেষ হয়ে যায়নি, তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে। আমরা আবার একসাথে জ্যোৎস্নাধোয়া রাতে তোমার হাতে হাত রেখে সুরের জগতে হারিয়ে যাব! পূর্ণিমারাতে আমাদের তাজমহল দেখাও যে বাকি!

আমাদের প্রিয় শান্তিনিকেতনে আমরা কতদিন যাইনি বল!

কতদিন খোয়াই এর ধারে হাঁটিনি আমরা,

আর ঋক্,

ওকে নিয়ে আমরা তোমার সেই ফেলে আসা স্মৃতিঘেরা ছেলেবেলা ফিরে পেতে তোমার গ্রামে যাব ভেবেছিলাম ...

***

ফোনটা বেজে উঠতেই মেয়েটি চমকে উঠলো । ও কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিল ? এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল! কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন ! মেয়েটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো । এখন আবার কে ফোন করলো, তাও আবার ল্যান্ডলাইনে, ভাবতে ভাবতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোনটা ধরলো,

"এটা কি ইমন সেনের বাড়ি? আমি সাবইনেস্পক্টর রণজয় বাসু বলছি ... "

যুক্তির ওপারে

এণাক্ষী মিশ্র

সত্যজিৎ রায়ের "সোনার কেল্লা"। ছোটবেলাতেই পড়েছে এবং ফিল্মও দেখেছে রুশা। একেবারে টান টান উত্তেজনায় ভরা গল্প। জাতিস্মরের ব্যাপারটা জানা ছিল না। গুগল করে এখন সেটাও পড়ে ফেলেছে।

এবারের পুজোর ছুটিতে জয়সলমীর বেড়াতে এসে উত্তেজনা তাই তুঙ্গে। আজ সকালেই সোনার কেল্লা দেখতে গিয়েছিল মা বাবার সাথে। ভারতের একমাত্র লিভিং ফোর্ট এটা। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল রুশার। ১১৫৫ সালে রাজা রাওয়াল জয়সোয়াল কর্তৃক তৈরি এই দূর্গে বংশানুক্রমিক ভাবে লোকেরা বসবাস করে আজ অবধি। দূর্গের ভিতর প্রচুর ছোট ছোট দোকান বাসিন্দাদের রোজগারের প্রধান উপায়। দূর্গের ভিতরটি একটি জমজমাট শহরের মত। এই ফোর্টের কয়েকটি গেটের মধ্যে "হাওয়া পোল" সবচাইতে সুন্দর। এই গেটের অতি সূক্ষ্ম জালির কাজ এর সৌন্দর্যের প্রধান কারণ। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রুশা।

একটা দেয়ালের পাশে উঁচু পাটাতনের উপর বসে কয়েকজন গান গাইছে এবং ওদের ট্র্যাডিশনাল বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে, যা কি না অনেকটা দোতারার মত। সুর শুনতে শুনতে রুশার মনে হঠাৎই একটু অস্বস্তি হয়। হাওয়াতে যেন বিগত কালের ফিসফিসানি শুনতে পায়। এই ঝরোখা, মহিলাদের উজ্জ্বল রঙের ঘাঘরা, ওর্ণি, কাঁচের কাজকরা কাঁচুলি, কনুই অবদি চুড়ি, হাতে-পায়ে-গলায় উল্কি- সব যেন কেমন চেনা চেনা লাগে। মাথাটা একদম গেছে মনে হয়। হেসে নিজের মাথায় চাঁটি মারে রুশা। অতিরিক্ত ঐতিহাসিক তথ্য এবং গল্প পড়ার ফল।

আগামীকাল ওরা কুল্ডহারা যাবে। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে "কুলঝাড়া"। এটি একটি পরিত্যক্ত গ্রাম। জয়সলমীর থেকে মোটামুটি চল্লিশ কিলোমিটার মত দূরে। এককালে এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রামটি ছিল পালিওয়াল ব্রাহ্মণদের। এই গ্রাম নিয়ে এখনও অনেক গল্প হাওয়ায় ভাসে। কথিত আছে গ্রামের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেখে তখনকার মন্ত্রী সেলিম সিং গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অন্যায্য ভাবে অতিরিক্ত কর দাবি করেন, যা দিতে না পারলে গ্রামের অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদের তিনি জবরদস্তি উঠিয়ে নিয়ে যাবেন। আত্মাভিমানী পালিওয়াল ব্রাহ্মণরা সেটা মেনে নিতে না পেরে এক রাতের মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। এ যেন একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। আজ অবধি তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায়। তাদের বাড়ি ঘর ধ্বংশস্তুপে পরিণত হয়। শুধু বাড়ি ঘরের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক বছর পর কিছু অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরিস্ট এসে ভগ্নস্তুপ থেকে কিছু সোনাদানাও পেয়েছিল। তারপর থেকেই ভারত সরকার কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এ সব কিছুই রুশা পড়ে ফেলেছে ইন্টারনেটে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট সেরে ওরা রওয়ানা হল। গাড়ির ব্যবস্থা করাই ছিল। উত্তেজনায় ধক্ ধক্ করছে রুশার বুকটা। শহর ছাড়িয়ে গাড়ি কুলঝাড়ার রাস্তা ধরলো। সরু পিচকরা রাস্তা মরুভূমির মাঝখান দিয়ে সোজা চলেছে তো চলেছেই। মনে হচ্ছে যেন এভাবে চলতে চলতে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে পৌঁছে যাবে। উল্টোদিক থেকে গাড়ি এলে একটু সরে গিয়ে কোনমতে জায়গা দিতে হয়, রাস্তা এত সরু। তবে গাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। কদাচিৎ একটা দুটো দেখা যায়। দু পাশে ধূ ধূ মরুভূমি। মাঝে মাঝে বহুদূরে বালিয়াড়ির আড়াল থেকে একটা দুটো মাটির বাড়ি নজরে পড়ে। রুশার একটু ঘুম ঘুম পেয়েছিল। হঠাৎ ড্রাইভারের ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে ঘুম ছুটে যায়। সামনে তাকিয়ে সবাই দেখে একটা ডেজার্ট স্নেক বা মরুভূমির সাপ রাস্তা পার করে চলে গেল। দারুণ অভিজ্ঞতা। অনেকটা যাবার পর ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। বললো- "সামনে দেখিয়ে। উয়ো নীলগাই হ্যায়।" সত্যিই দেখি গাড়ির সামনে দৌড়ে চলেছে একটা নীলগাই। দেখতে অনেকটা গরু এবং ঘোড়ার মাঝামাঝি। তবে এরা আসলে হরিণ জাতীয়। একটু সময় দৌড়ে ওটা ডানদিকে নেমে বালিয়াড়ির পেছনে হারিয়ে গেল। রুশা এই প্রথমবার নীলগাই দেখল। সত্যি, বেড়ানো মানেই অনেক কিছু শেখা। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের কত গল্প শোনাতে পারবে, তাই ভাবলো রুশা।

অবশেষে ওরা একটা গেট-এর সামনে এসে পৌঁছুল। এটাই কুলঝাড়া গ্রামের গেট। গাড়ি গিয়ে থামতেই গেটের পাশ থেকে একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। হাতে লাঠি, মাথায় মস্ত পাগড়ি। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। অবশ্য অতিরিক্ত রোদ এবং গরমে এখানের মানুষের চামড়া অনেক কম বয়স থেকেই কুঁচকে যায়। তাই বয়স বোঝা খুব মুশকিল। রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া তামাটে। প্রকান্ড পাকানো গোঁফ। পায়ে নাগরা জুতো। গায়ে দড়িবাঁধা সাদা ফতুয়া মত জামা। তার সাথে সাদা ধুতি হাঁটু অবধি উঁচু করে পরা। হাতের এবং পায়ের ফোলা ফোলা শিরায় জীবন সংগ্রামের ছাপ স্পষ্ট। বিড়ি খেয়ে কালো হয়ে যাওয়া ক্ষয়াটে দন্তপাটি বিকশিত করে হাসিমুখে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, হেঁটে হেঁটে গ্রাম ঘুরে দেখলে দশ টাকার টিকিট লাগবে। আর গাড়ি নিয়ে ঢুকলে পঞ্চাশ টাকার টিকিট লাগবে। রুশার বাবা পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে নিলেন। এই গ্রামটা আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া (Archeological Survey of India) দেখাশোনা করে।

গাড়ি নিয়ে প্রথমেই ওরা গেল গ্রামের মাঝখানে থাকা একমাত্র মন্দিরের কাছে। এই মন্দির ছাড়া বাকি সব বাড়িঘরের শুধুমাত্র দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সব বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে। গ্রামের রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে। দু ধারে বাড়ি ঘরের কঙ্কাল। পুরো গ্রামে মন্দিরটিই একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটি দোতলা। দেয়ালে মেটে রঙের ওপর সাদা রঙ্ দিয়ে নকসা আঁকা। গর্ভগৃহে এককালে নিশ্চয়ই কোন ঠাকুর দেবতার মূর্তি ছিল। এখন সেটা কালের গর্ভেই হারিয়ে গেছে।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলো। রুশার হঠাৎই খুব অস্বস্তি হওয়া শুরু হল। হঠাৎই ওর কানে কে যেন ফিসফিস করে কিছু বলে গেল। রুশার মনে হল এই মন্দির ওর খুব চেনা। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে রুশা ক্রমশই মা বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে লাগলো। মা হেঁকে বললেন- "রুশা একা যাস না। এদিকটা দেখে নিয়ে আমরাও ওদিকে যাব।" ড্রাইভার বললো, - "কুছ নেহী হোগা মাতাজী। চিন্তা মত করিয়ে। হম গাড়ি লেকে অভী

যায়েঙ্গে না উস তরফ্।" রুশা তো মায়ের ডাক শুনতেই পায়নি। ততক্ষণে সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ হাওয়া উঠলো। সাথে ধূলোর ঝড়। "আঁধি আঁধি " - ড্রাইভার চীৎকার করে বললো। "জলদি গাড়িমে বৈঠিয়ে। হমে বিটিয়াকো বচানা হোগা"। রুশার মায়ের হাহাকার ঝড়ের তাণ্ডবে চাপা পড়ে গেল - রুশা রুশা রুশা ....কোথায় তুই রুশা......?" ঝড়ের মধ্যেই ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে চললো রুশা যেদিকে গেছে সেদিকে। কিন্তু কোথাও রুশার দেখা পাওয়া গেল না। মরুঝড় খুব সাংঘাতিক হয় সব কিছু বালিতে চাপা পড়ে যায়। কিন্তু ড্রাইভারের মতে এদিকে বিশেষ মরুঝড় হয়না। সে কখনও শোনেনি। আর আজ এই অবস্থা। কিছু সময় পর ঝড় থেমে গেল। কিন্তু সারাদিন খোঁজাখুঁজি করেও রুশাকে কোথাও পাওয়া গেল না। পুলিশেও খবর দেওয়া হল।

এদিকে রুশার কি হল? রুশা যেন অনেক পুরনো সময়ে চলে গেছে। সব চেনা, সব জানা। সেই ভয়ঙ্কর রাত ছবির মত চোখের সামনে ভেসে যেতে লাগলো। সেই উটের পিঠে লটবহর চাপিয়ে ওদের নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা।

ধূলোর ঝড় থেকে বাঁচতে একটা বাড়ির দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিল রুশা। সাথে সাথেই সেই বাড়িটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। আবছা আবছা দেখতে পেল তার পূর্বজন্মের স্নেহময়ী মা কে। আবার দেখলো, লোকজন সবাই ছুটোছুটি করছে, বাক্স প্যাটরা বাঁধছে, উটের গাড়িতে মাল তুলছে। গোটা গ্রাম জুড়ে মানুষজন ছুটোছুটি করছে, কিন্তু সব নিশ্চুপে, অন্ধকারে। তারপর যাত্রা শুরু হল। উটে টানা গাড়িতে গাদাগাদি ভিড়। সবাই কাঁদছে। বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি আসছে। ভোর হওয়ার আগেই ওদেরকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে হবে। কোন রাজপুরুষের হাতের থাবা পড়বেনা সেখানে। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রুশা জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নামছে। সন্ধ্যে ছ'টার সময় কুলঝাড়ার গেট বন্ধ হয়ে যায়। তাই সবাইকে বেরিয়ে যেতে হয়। মেয়ে হারিয়ে পাগলপ্রায় রুশার মা বাবাকেও বেরিয়ে যেতে হল। ড্রাইভার বললো পরদিন সকাল সকাল ওদেরকে নিয়ে আসবে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে নতুন করে খোঁজা হবে। রুশাহীন বিভীষিকাময় বিনিদ্র রাত কাটলো রুশার মা বাবার।

পরদিন সকাল সকাল ওরা পৌঁছে গেলেন কুলঝাড়ার গেটে। প্রচুর পুলিশও ততক্ষণে এসে পড়েছে। তারপর শুরু হল চিরুনি তল্লাসি। ঘন্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল প্রায় বালিতে চাপা পড়া, একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা অচৈতন্য রুশাকে। তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল।

বিকেল নাগাদ রুশার জ্ঞান ফিরলো। প্রথমে ও মা বাবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। রুশা বুঝতেই পারছিলো না ও কোথায়? চারদিকে কেন এত ডাক্তার, নার্স? ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যেতে লাগলো রুশার। এমনকি ওর পূর্ব জীবনের কথাও। "তাহলে কি আমি জাতিস্মর?" ভাবলো রুশা। মেয়েকে স্বাভাবিক দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ওর মা বাবা। কিন্তু রুশার ডানহাতের কব্জির ওপর একটা ফুলকাটা চুড়ির নক্সার উল্কি দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল। এটা কি করে এলো? রুশার হাতে তো কোন উল্কি ছিল না! ঠিক যেন চুড়ি পরে আছে। গোপনে হেসে রুশা পরম মমতায় ওটার ওপর হাত রেখে পাশ ফিরে শুলো। ওটা যে পার্বতীর হাতে ছিল। এই গোপন কথাটি কেউ কখনও জানবে না।

অনুরণন

সুরজিৎ প্রামাণিক

এই খুশির খবরটা প্রথম বাড়িতে জানাবার পর আর কাকে বলা যায়, ভাবতে ভাবতে রিতার কথা মনে হল দীপের। ভাবল সরাসরি চলেই যাই ওদের বাড়ি। কখনো কখনো খবর ফোনে জানালে উল্টো দিকে যে আছে তার অভিব্যাক্তি ঠিক বোঝা যায়না।এক্ষেত্রে সেটা খুব জরুরি! তাই একটু জোরেই পা চালাল দীপ।আজ বৃহস্পতিবার, রিতার সাপ্তাহিক ছুটির দিন, এখন ও বাড়িতেই থাকবে আশা করা যায়। একেবারে সারপ্রাইস ভিজিট হবে। এনেক দিন কোন খবর নেওয়া হয়নি।

কলেজ শেষ হয়েছে প্রায় সাত বছর হতে চলল। দীপ অবশ্য তাড়াতাড়ি চাকরি পেয়ে যায়, রিতা পরের বছর। এত দিনে রিতা সেই একই চাকরিতে বহাল এবং বেশ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দীপ দুম করে চাকরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। এই নিয়ে দীপের বাড়িতে বেশ মতবিরোধ ছিল। মা কিছুটা মেনে নিলেও, বাবার খুব আপত্তি ছিল। কিন্তু চাকরি ছেড়ে ব্যাবসা করব বললেই তো আর সহজে সেটা করে ওঠা যাবে না। এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কি ভাবে সামাল দেবে এই নিয়ে দীপ বেশ চাপে পড়ে যায়।

রিতার বাড়িতে আবার উল্টো। কাকিমা বলেছিলেন,"তাই বলে হঠাৎ কেউ চাকরি ছাড়ে? চাকরি করতে করতে ব্যাবসা করতে পারত।পরে দাঁড়িয়ে গেলে, তখন চাকরিটা ছাড়ত!" কাকু আবার দীপের সাথে একমত ।"দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যায়না, ব্যাবসা করা একশোবার ঝুঁকি, কিন্তু এখন না নিলে কবে নেবে? না হলে আমাদের মতো শেষে এসে দেখবে জীবন খাতায় শূন্য!" রিতা বলেছিল, "লাইফ টা তোর, তুই কি ভাবে কাটাবি সেই সিদ্ধান্ত তোকে নিজেকেই নিতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাব, তুই ব্যাবসাটা এ টু জেড একা কীভাবে করবি। প্লানিং থেকে এক্সিকিউসান, ফাইনান্স সব, আমরা তোর যতই ভাল চাই না কেন, তোকে এই ব্যাপারে কোন হেল্প করতে পারব না, কারন আমরা তো সেই বিষয়ে কিছুই জানিনা!"

দীর্ঘ তিন-চার মাস একপ্রকার উপার্জনহীন হয়ে, দীপ সংসারের অনেক প্রিয়জনের অনেক রূপ দেখে নিয়েছে। সেই সব আর না ভেবে ব্যাবসা শুরুর সব খুঁটিনাটি কাজ গুলো ধিরে ধিরে প্রায় শেষ করে এসেছে। শুধু যেই কোম্পানির সাথে কাজ শুরু করার জন্য দীপ বড় একটা ঝুঁকি নিল তার প্রোডাক্ট আপ্রুভাল বাকি। তাতেও যেন কত বিনিদ্র রাত কেটেছে, শেষে কী হয় কী হয়। স্বপ্ন তো বিশাল কিছু নয়, শুধু স্বাধীন ভাবে নিজের কাজ করা। অন্তত চাকরি করে যে মাইনে পাওয়া যেত আপাতত তেমন কিছু রোজকার করতে পারলেই খুশি।সাথে উপরি পাওনা, নিজেই নিজের মালিক!

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এসেছে দীপ, আর কিছুটা বাকি। কিন্তু কী ভাবে কথাটা পাড়বে? নতুন চাকরি বা বড় প্রোমোশন সেটাও বলা যায়, কিন্তু স্যাম্পেল আপ্রুভাল এবং অর্ডার ফাইনাল হয়েছে সেটা কি বলার মত কিছু? কিন্তু দীপের কাছে এটাই সব। যে ব্যাবসা সুরু করার জন্য ও চাকরি ছেড়ে ছিল, যদি সেটাই না হত তা হলে একেবারে তলিয়ে যেত ও। তাই এই আনন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং–এ সুযোগ পাওয়া বা চাকরি পাওয়া, তার থেকেও ওনেক বেশি। যদিও ব্যাপারটা আপেক্ষিক তবুও কেন যেন রিতার এই বিষয়ের অনুভূতি ঠিক কেমন সেটা জানতেই এখানে আসা।

দরজার সামনে আসতেই বাড়িটা বেশ নিস্তব্দ মনে হল। কেউ কি নেই? অনেকক্ষণ বেল বাজানোর পর কাকিমা এলেন। খুব বিমর্ষ ও বিষণ্ণ মনে হল।

-"এত দিনে খবর পেলে?"

-"কিসের খবর? কার, কি হয়েছে?" দীপ আকাশ থেকে পড়ল।

-"রিতার তো বিশাল অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। অন্ধ হয়ে যায়নি এই রক্ষে। আরও অনেক কিছু হতে পারত।" ছলছল চোখে কাঁপা হাতে কাকিমা গেট খুললেন।

-"অ্যাকসিডেন্ট! সেকি, কবে? কিভাবে?" দীপ ভীষণ ভাবে বিস্মিত।

-"যাও। রিতা ওপরের ঘরে আছে।" কাকিমা দীপকে জায়গা দিয়ে গেট বন্ধ করলেন।

দীপ গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে ওপেরে উঠে, ভয়ে ভয়ে রিতার ঘরে উঁকি দিল। এই ভয়ানক দুঃসংবাদের জন্য ও একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। যে আনন্দ ও খুশি নিয়ে ও কয়েক মুহূর্ত আগেও কলিং বেল দিয়েছিল তা এভাবে মিলিয়ে যাবে সেটা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি!

বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল রিতা। ঘাড় ঘুরিয়ে দীপকে দেখে রিতাও যেন অবাক। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ একে অপেরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর রিতা অভিমানী সুরে বলল, "বন্ধুদের মধ্যে তুইই সবার শেষে এলি!" গলার স্বর ক্ষীণ, দুর্বল, কাঁপা। যেন কথা বলতে কত কষ্ট!

কোন কথা না বলে, দীপ শুধু রিতাকে দেখেতে লাগল। প্রায় পুর মুখটাই ব্যান্ডেজ। ডান দিকের চোখটা শুধু বাদ। বামদিকের চোখ আলাদা করে ব্যান্ডেজ করা, মুখটা খোলা আছে, হয়তো খাবার খাওয়ার জন্য।নাকের নিচের দিকে সামান্য খোলা, শুধু শ্বাস প্রশ্বাস এর জন্য। কী অসম্ভব যন্ত্রণায়-শারীরিক ও মানসিক, এতটা সময় ও কাটিয়েছে ভাবলেই মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

-"বিশ্বাস কর, আমি জানতাম না! ইচ্ছা করেই এতদিন সব বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখিনি। আমার অবস্থা তো তুই জানিস। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো। মাঝে কিছুদিন অবশ্য কলকাতায় ছিলামনা। প্রায় দশ দিন পর ফিরলাম।কাজের চাপ ও অনিশ্চয়তায় আমার মনও ভাল ছিল না। চাকরি ছাড়ার পর মনেহল বন্ধুরাও আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। সবাই এখন চাকরি করছে, আর আমি বেকার। বাড়িতেও আমার মূল্য কমে আসছিল!" মাথা নিচুকরে আক্ষেপের সুরে দীপ কথা গুলো থেমে থেমে বলে গেল। তারপর জালনা থেকে ফিরে রিতার দিকে তাকিয়ে বলল "কীভাবে হল? সংক্ষেপে বল"

-"কী বলব ...আমি বাসের বাঁদিকে বসে ছিলাম। লোহার রড নিয়ে একটা লরি যাচ্ছিল।আচমকা লরিটা বাঁদিকের গলিতে টার্ন নিতেই, বেরিয়ে থাকা রডগুলো জোরে ধাক্কা মারল ।জানলার কাঁচ ভেঙে আমার মুখে ... "

-"থাক, আর বেশি কথা বলতে হবেনা", কাকিমা ওপরে উঠে এসেছেন। দীপের দিকে ফিরে বললেন, "ডাক্তার বেশি কথা বলতে বারন করেছেন।" চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,"বাম চোখের নিচ থেকে নাকের হাড় ভেঙে কপাল পর্যন্ত কোনাকুনি ডিপ হয়ে কেটে গেছে। কত সেলাই যে পড়েছে! পুরো মুখে ভর্তি। ভাগ্য ভাল যে চোখটা বেঁচে গেছে! তিন দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিল। পরশু আবার হাসপাতালে চেকআপে যেতে হবে।"

-"থাকনা মা, ও বুঝে গেছে।" কাতর কণ্ঠে মাকে থামায় রিতা। "পারলে, বাঁদিকের চোখের বাণ্ডেজটা খূলে দাও। এক চোখে ভালোকরে দেখা যায়না। কেমন অস্বস্তি করে।"

কাকিমা চোখের বাঁধনটা খুলতেই, দীপ অপলকে রিতার ঝন্ত্রনাবিদ্ধ মুখ, ফোলা ও বীভৎস চোখের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যায়।

-"এখনও খুব ব্যাথা?" বিমর্ষ মুখে বলে দীপ।

-"আগের থেকে একটু কমেছে। কিন্তু নাকের হাড় ভেঙেছে, তাতে নাক ও কপালে কাটা দাগ সহজে মিটবে না, ডাক্তারবাবু বলেছেন!" ঘটনার আকস্মিতায় দীপও যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। কোন সান্ত্বনা বা আশ্বাস যেন সবই বেমানান এখন।

-"একটু ওঠ। অনেক্ষন শুয়ে আছিস। বারান্দায় যাবি? বিকেলের সুন্দর হাওয়ায় ভাল লাগবে।" রিতাকে বলেন মা।"চা খাবে তো দীপ?"

-"সাথে পাঁপড় বা নিমকি ভাজোনা মা, বেশ খেতে ইচ্ছে করছে।" রিতার খুশির আব্দার।

এই কথায় কাকিমার বিষণ্ন মুখে যেন খুশির হাওয়া খেলে গেল। "দেখোনা ক'দিন কিছুই খেতে চাইছিল না। এখন কি যে হল, নিজেই বলল!" রিতাকে ধরে বারান্দায় আনবার সময় কাকিমা বললেন "নিচে গেলাম"। তার আগে বিছানা থেকে একটা চাদর এনে গায়ে জড়িয়ে দিলেন।

-"এখানে বোস।বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবিনা" চেয়ারটা এগিয়ে দেয় দীপ আর মনে মনে বলে কি ভেবে এলাম আর কি হল। ও বুঝল খুব কষ্ট না হলে, রিতার সাথে কথা বললে ওর কিছুটা ভালই লাগবে। জমাট বাঁধা যন্ত্রণা কিছুটা হলেও হাল্কা হবে, মনের ভারাক্রান্ত ভাবটা্ও কমবে।

-"তুই মনেহয় কিছু একটা বলতে এসেছিলি", দীপকে চমকে দেয় রিতা, বলে "মুম্বাই-এর মিটিং আশাকরি সাকসেস। তোর অনেকদিনের প্রচেষ্টার ফল এবার মিলবে।"। দীপ অবাক হয়ে যায় বলে, "তুই কি করে বুঝলি?"

-"টেলিপ্যাথি!"

-"বাব্বা তোর টেলিপ্যাথি-র জোর আছে মানতে হবে।" দুজনের মধ্যে খেলেযায় এক অনাবিল আনন্দের আলো। রিতার সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ চোখ মুখ যেন আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। ব্যান্ডেজ-এর বাইরে চোখের যতটুকু দেখা যায়, তাতেই অপলকে তাকিয়ে থাকে দীপ।বিনা কথায় সমস্ত অভিব্যক্তি বুঝে নিতে চায় ও।

-"সত্যি সত্যিই ডাক্তার বেশি কিথা বলতে বারন করেছেন।" নিস্তব্ধতা ভেঙে শুরু করে রিতা। "কিন্তু শুনতে নয়। অতএব তোর কথা বল। এবার কীভাবে এগোবার প্লান করছিস?"

-"প্লান তো আছেই, কিন্তু এখন ওসব থাক। তুই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।তারপর সব হবে"।

-"ও, ঠিক আছে বলতে হবে না, থাক। তবে আমারও একটা খবর আছে, সেটাও বলব না"।

-"প্লিজ সব পরে হবে, সবাই তখন সবার কথা শুনব।"

বারান্দায় এতক্ষন দীপ রিতার পাশে দাঁড়িয়ে ওর ঘরের ভেতরটা ভাল করে দেখছিল।

-"তোর খবর আমি জানি।"

-"ভুল। তুই যা ভাবছিস, তা নয়। ফুলটা অন্য কেউ পাঠিয়েছে।"

-"রজত কি এসেছিল?" দীপের চোখে কৌতুক। "তোদের ব্যাপারটা কতদূর এগোল?"

-"বাপরে, তুই তো চমকে দিলি!" রিতা যেন ধীরে ধীরে যন্ত্রণা বিদ্ধ শরীর ও মন থেকে ভীষণ ভাবে বেরতে চাইছে। ডাক্তারের বারন আর কে শুনছে, তাহলে তো ইশারায় কথা বলতে হবে। তাই কিছু কথা না বললেই নয়। দীপ নিজেও তো এটাই চাইছিল।

-"তাহলে আমারও টেলিপ্যাথি-র জোর আছে বলছিস?"

-"সে আর বলতে!" হো হো করে হেসে উঠল দুজনে।

রিতা আবার দূরে পড়ন্ত বিকেলের আলোয় লাল কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকাল। দীপ এখান থেকে অনেকবার এই দৃশ্য দেখেছে, কী অপূর্ব লাগে।

-"না রজত আসেনি তবে ওদের বাড়ি থেকে বাবা মা এসেছিলেন। আমার অ্যাকসিডেন্ট-এর আগের দিন রজত ব্যাঙ্গালোর চলে গিয়েছিল, তাই আমার এই রূপ ও দেখেনি।" রিতা কিছুটা থামল। আবার দূরের দিকে তাকিয়ে বলল "ওর বাবা মা মনে হল খুব তাড়াহুড়ো করছেন। বললেন রজত নাকি তিন মাসের জন্য ব্যাঙ্গালোর গেছে, মাঝে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরবে। তারপর প্রায় দুবছরের জন্য ইউরোপের কোন এক দেশে পোস্টিং। তাই..."

-"তার আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইছে? খুব সিম্পল। ভালই তো। সমস্যা কোথায়?"

-"এই সব কথা কিন্তু রজত আমাকে কিছুই বলেনি। বরং ওর বাড়ির লোক এখান থেকে যাওয়ার পর কেউ যোগাযোগ করে নি। এমনকি রজত আর ফোনও করেনি।আমার ফোনের বা টেক্সট-এর জবাবও দেয়নি! মনে হচ্ছে সম্পর্কের সেই সুর তাল ছন্দ আর নেই!" রিতার মুখের ওপর থেকে বিকেলের সেই স্নিগ্ধ মোলায়েম নরম আলোটা যেন হঠাৎ নিভে গেল! কোথাথেকে একটা ঘন মেঘে ছেয়ে গেল চারিদিক। নিকষ কালো অন্ধকার।

-" কিন্তু আমি ভাবছি যদি এটা বিয়ের পর হত, তবে? এটাতো ঠিক যে আমার এই কাটা দাগ হয়ত আর কোন দিনই সেভাবে মিটবে না। নাকের শেপ কেমন হবে, ডাক্তারও নিশ্চিত নয়। রজত কীভাবে মেনে নেবে? তাছাড়া আমার এত কষ্টের পাওয়া চাকরি ছেড়ে ওর সাথে ল্যাজ হয়ে ঘুরতে হবে। নিষ্কর্মার মত। আমার নিজের আইডেন্টিটি কে বিসর্জন দিয়ে শুধু অন্যের বউ-এর পরিচয়ে বাঁচতে মতো। তাহলে এত কষ্ট করে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে লাভ কী, তাকে যদি বিসর্জনই দিতে হয়?" দূরে তাকিয়ে উদাস ভাবে কথাগুলো রিতা নিজের সাথেই আনমনে বল চলল।

-"কেন? এসব কথা আজ মনে হচ্ছে? তোদের সম্পর্ক তো অনেক দিনের। তাহলে নিজেদেরকে তোরা এই চিনলি?"

রিতা এবার সরাসরি দীপের দিকে স্থির ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,"সম্পর্কের মধ্যে দিনের সংখ্যা হয়ত অনেক, কিন্তু এখনকার এই দিন গুলো তার মধ্যে কখনই ছিল না। তাই দিনের সংখ্যা নয়, সঠিক সময় ও পরিস্থিতি এবং ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়েই আজ নতুন করে সব কিছু চিনছি!"

-"এবার থাক, অনেক বেশি কথা হয়ে যাচ্ছে।" দীপ রিতাকে থামায়। মনের মধ্যে যে ভাবে কালো মেঘ ছেয়ে গেছে, হয়তো এখনই বৃষ্টি নামবে।

-"হ্যাঁ।" কখন যে কাকিমা চা ও নিমকি নিয়ে হাজির কেউ খেয়াল করে নি।

- "দিন।" দীপ প্লেট গুলো নিয়ে বারান্দার গ্রীলের ওপর রেখে, রিতাকে নিতে ইশারা করল।

- "একটু জল খাব মা।" ফ্যাকাসে মুখে রিতা মায়ের দিকে তাকায়।বারন করা সত্ত্বেও এত কথা বলায় মা বেশ অখুশি।

- "সে তো হবেই।" দীপের হাত থেকে জলের বোতল নিয়ে সাবধানে খাওয়ান মা।সঙ্গে সতর্ক বার্তা,"বেশি কথা কিন্তু আর নয়।"

- "ঠিক বলেছেন, আমি থাকেলেই ও বেশি বকবে। তার চেয়ে চা খেয়ে কেটে পড়ি। পরে আবার আসব। তবে কাল নয় পরশু। তোর সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাব।"

- "আরে না না, ওর বাবা অফিস ছুটি নেবে বলেছে। তোমায় ব্যাস্ত হতে হবে না।" কাকিমা কিছুটা সঙ্কোচ ও দ্বিধা নিয়ে বললেন।

-"ঠিক আছে, ও যাক না।" রিতা বেশ সহজ ভাবেই মা কে বলল। "তুমি আর দীপ থাকলেই হবে। তা হলে বাবাকে আর ছুটি নিতে হবে না।তার চেয়ে তুমি নিচে যাও। দেখ রান্না ঘরে কিছু চাপিয়ে এসেছ কি না" ।মা কে জড়িয়ে ধরে রিতার আব্দার।রিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বললেন "অগত্যা!" ফিরে যেতে যেতে পিছন ফিরলেন,"না রান্না ঘরে কিছু চাপিয়ে আসিনি!"

এই অলস পড়ন্ত বিকেলে যেন কোথা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে এলো। মনের মধ্যে যে ভাবে কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে, আর হয়তো বৃষ্টি নামবে না। দীপ রিতার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। ঘাড় ঘুরিয়ে মা'র চলে যাওয়া দেখে রিতা বেশ কৌতূহলের সাথে দীপের দিকে ফিরে দেখে ও খুব দ্রুততার সাথে চা ও নিমকি শেষ করার চেষ্টায় আছে। যেন এক্ষুনি ওকে চলে যেতে হবে।

-"আরে আস্তে, আস্তে। তুই কি সত্যি সত্যিই এখুনি চলে যাবি নাকি? ঠিক আছে আমি আর বেশি কথা বলব না। শুধু একটা। মানে জাস্ট তোর মতামত নেব আর কি!"

-"আবার একটা! থাক না আজ"। দীপ চা-এর কাপটা প্লেটের ওপর রেখে রিতাকে থামাতে বিফল চেষ্টা করে।

-"ধর, মানে হতেও তো পারে, আমার এই চেহারার কথা ভেবে, মেইনলি এই আ অসুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা আমাদের বিয়েটা ক্যানসেল করে দিল। করতেই পারে। রজত এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত। তাই আরও সুন্দরী বউ ও পেতে পারে, এদিকে আমার অবস্থা! মুখে চারিদিকে কাটা দাগ, নাক বাঁকা!" রিতা যেন আচমকাই সিরিয়াস। দূরের পড়ন্ত নিভু নিভু সূর্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে সরাসরি দীপের দিকে তাকাল। দৃষ্টি স্থির ও শান্ত, কিন্তু গভীর। "তাহলে?"

এই আচমকা ও অনভিপ্রেত প্রশ্নে দীপও কিছুটা নড়ে যায়। এক আপাত নিরীহ, অথচ কী কঠিন ও নাছোড়বান্দা এই প্রশ্নের জবাব কি এক্ষুনি দিতে হবে? পরে বলা যাবে না? এই জবাবের সাথে ও নিজেও কী জড়িয়ে পড়েছে ভীষন ভাবে? দীপ কয়েক মুহূর্ত সেই সূর্যাস্তের দিকে তাকালেও বোঝাযায় রিতা কিন্তু উত্তরের আশায় একই ভাবে দীপের দিকে তাকিয়ে। তা সত্ত্বেও দীপ কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে থমকে থাকার পর, সরাসরি রিতার দিকে ফিরল। কিছুটা ঝুঁকে স্মিত হেসে বলল, "কেন, আমি তো রইলাম!" হঠাৎ নিস্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত, তারপর দুজনের অট্টহাস্যে সেই নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল।

কোলের ওপর রাখা রিতার ডান হাতে দীপ বাঁ হাত রাখতেই রিতা আবেশে চোখ বুজে বলল, "হাতের ওপর হাত রাখা খুব সহজ নয়"।

-"সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়", দীপও পরের লাইন বলল।

-"এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে..." রিতা পরের লাইন বলেই দীপকে ঠেলা দিল দরজার দিকে "যা, আর তোকে আটকাব না, আর বকবকও করবনা"। যেন সব উত্তর পাওয়া হয়ে গিয়েছে। "যাওয়ার সময় মা কে বলিস আমি ডাকছি"।

-"সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়" দীপ যাওয়ার সময় পিছন ফিরে সহাস্যে বলে গেল।

রিতা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সূর্যের শেষ রক্তিম আভা দুরের কৃষ্ণচূড়া ফুলের রঙে একেবারে মিশে গেছে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বারান্দার এই দৃশ্যে মন এক স্নিগ্ধ ও মোলায়েম আবেশে ভরে যায়। এ তো নিত্য দিনের ঘটনা, তবুও আজ, এখন যেন একেবারে নতুন। হাল্কা ঠাণ্ডা হাওয়ায় চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ব্যান্ডেজের ওপর দিয়েই দুই তালুতে মুখ ঢেকে চোখ বন্ধ করে নিল। পরম যত্নে আলতো স্পর্শ করল সেই ব্যাথার ফোলা জায়গাগুলো। কী অদ্ভুত, ব্যাথা যেন কমে আসছে! নিজেকে দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। মোবাইলের ক্যামেরায় তাকিয়ে যেন বিশ্বাসই হয় না। এই সেই আমি। যে এতক্ষন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ছিলাম, ভেবে ছিলাম আর হয়ত আমার এই মুখ ও মনের গভীর দাগ কোন দিনই মিটবে না, অথচ এখন কোন জাদু বলে সেসব কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে মেলে ধরতেই, গায়ে জড়ানো বেড শিটের ওপের আঁকা ছবির পাখি গুলো যেন হঠাৎ কিচিরমিচির করে ডেকে উঠল। ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে তারাও।

আলমারিতে

কেয়া ভট্টাচার্য্য

আঃ ...... !! চায়ের কাপে চুমুক এর সাথে সাথে পরম তৃপ্তির থেকে বড় চরম বিস্ময় -

"এই চা পেলে কোথায়?"

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। LOCKDOWN এ এই ২ বছর কেউ দেশে যেতে পারেনি। আর এই চা শিয়ালদার উষা টি - বলে দিতে হবে না।

কারোর না কারোর ঘরে get together বরাবরই ছিল। কখনো Independence day পালন, কখনো India final এ উঠেছে, কখনও বা পুজোর meeting, বিভিন্ন নামে। লম্বা summer vacation এ Mrs-রা দেশে গেলে দাদাদের Bachelor party ও হত। Birthday party হত বছরে এক বার, January থেকে December এর মধ্যে যাদের যাদের জন্মদিন, তাদের সবার জন্য একসাথে জন্মদিন পালন। উপলক্ষ যাই হোক না কেন, এ জমায়েত যেন একটা ছোট্ট ভারতবর্ষ। ভেঙ্কটেশের আনা কলার চিপস, অরুণার আনা ধোকলা, সৌজাসের আনা চমচম - এসবেই ভরে উঠতো আড্ডা। দেশ থেকে আনা খাবার নয়, একটুকরো ছোটবেলার স্বাদ বিতরণ করতো সবাই।

আজ ২ বছর কেউ ফিরতে পারেনি দেশে। ঘরের আড্ডাগুলোই আজ পরম প্রাপ্তি। সাথে বৌদিদের রান্না। লুচি, নিরামিষ আলুরদম, পোস্ত, মাছের ঝোল, চিংড়ির মালাইকারি, পাঁঠার মাংস, চাটনি, ঘরে পাতা মিষ্টি দই - সব মিলিয়ে বাংলার স্বাদ পায় একদল প্রবাসী - যারা আজ কাজের ক্ষেত্রে দেশ ছেড়ে অনেক দূরে - জাপানের মাটিতে - প্রতিঠিত করেছে নিজেদের বিভিন্ন পেশায়।

"আরে last যখন কলকাতা থেকে ফিরলাম, 1 kg নিয়ে এসেছিলাম। " দোলাদি বলে চলে - "তারপর থেকে তো কাড়া, hotship, এর ধুম চললো, তাই রয়ে গেছে।"

"তুমি last কবে গিয়েছো সোমা?"

"২০২০ এর January তে ফিরেছি। তখনি মায়ের জন্য একটা কোমরের ব্যথার belt নিয়ে গেছিলাম। সেদিন জিজাসা করলাম, ওটা পরছো? কি বললো জানিস?"

"আলমারিতে....."

উত্তরটা এল সামবেত কণ্ঠে। দোলা, অনুসূয়া, পল্লবী, কুহেলি, আলাপন, সুস্মিত, বৈদুর্য, আশীষ - সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো।

সোমা অবাক! তাকিয়ে রইলো!

আলাপন বললো "জানি তো, আমি একটা cooker দিলাম। মা বললো - 'ও তোরা যখন সবাই আসবি, তখন ওতে হবে। আমি একা মানুষ, যেটা আছে ওতেই চলে যায়।"

বৈদুর্য বলে উঠলো "আরে আমি একটা ঘরে পরার নরম জুতো দিয়েছিলুম, সেটাও আলমারিতে রেখেছে। কিছু বললে বলবে - অত ভালো জিনিসটা, পড়লে খারাপ হয়ে যাবে।"

হাসির তুফান উঠলো।

দোলাদি বলে উঠলো "আর বলিস না, আমি শাড়ি দিয়েছিলাম একটা, বললাম পরেছ? - 'না রে, ও নতুন, তুই এসে ভেঙে দিয়ে যা, তারপর পরবো.' বোঝ, শুধু শাড়ি দিলে হবে না, তাকে আবার ভেঙে দিতে হবে!"

"তাহলে আমারটা শোনো।" বলে উঠলো আশীষ। "কয়েক বছর আগে একটা দাড়ি কাটার trimmer দিয়েছিলাম বাবাকে, যাতে সেলুনে যেতে না হয়। সেই trimmer এর স্থান আলমারিতে তো বটেই, তার থেকেও বড় কথা তার কারণ টা - পাড়ার ওই সেলুনেই তো বসে আড্ডা। ওই আড্ডায় না গিয়ে বাবা থাকতে পারবে না, সাথে দাড়ি কাটা তো extra।"

হাসিতে ভরে গেলো সারা ঘর।

সুস্মিত এতক্ষন চুপ ছিল, আর পারলো না- "use না করলে তো জিনিস টা নষ্ট হয়ে যাবে, এটা বোঝে না। আর তোমরা use করলে আমাদেরও তো ভালো লাগে, কে বোঝাবে?"

দেখা গেলো, সব বাবা-মায়ের একই কথা, সবাই এলে ওসব ব্যবহার করবো। এত ভালো জিনিস, শুধু আমাদের জন্য ব্যবহার করে কি করবো? তাই তাদের সবার স্থান - আলমারিতে।

রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় যত বাড়ি বা আবাসন দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বহু ঘরে রয়েছেন এমনই মা বাবা আর তাদের এমন আলমারি, যার মধ্যে নিজেদের সব স্বপ্নগুলো আটকে রেখে নিজেদের সিন্দুকের সব থেকে দামি রত্নটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বহুদূরে, ভালোবেসে, স্বার্থত্যাগ করে। আর সবার মত এঁরাও একদিন অনেক কষ্ট করে সন্তান প্রতিপালন করেছেন। কিন্তু আজ, তার প্রতিদানে সন্তানের সেবা চান না বরং সন্তানের নিরাপত্তা, তাদের উন্নতি এঁদের একান্ত কাম্য। এঁরাই যেন "প্রতিপালক " কথাটির জীবন্ত উদাহরণ।

মৌমিতা বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণী

লোডশেডিং

উদয় চক্রবর্তী

সে অনেক দিন আগের কথা।

৭০ এর দশক। কলেজে পড়ি।

কলেজ মানেই মুক্ত জীবনে যৌবনের দাপাদাপি। সিগারেট ফুকতে শেখা, প্রেম করা, কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখা। বেপরোয়া, রাগী রাগী ভাব। কলেজ মানে তখন ছিল রাজনীতির আখড়া। যেন সমাজটাকে পাল্টে দেবার দায় আমাদের উপর। প্রতিবাদ আন্দোলন প্রতিদিনের এজেন্ডা।

লোডশেডিং এর উৎপাত ছিল খুব। কলেজে জেনারেটরের বালাই ছিল না। একবার বিদ্যুৎ গেলে কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। গরমে হাঁসফাঁস। তালপাতার পাখা নিয়ে তো আর কলেজে যাওয়া যায় না। কষ্ট হত, তবু সহ্য করতে হত। ৮-১০ জন ছাত্র মিলে একদিন ইলেকট্রিক অফিসে হানা দিলাম। কাছে ইলেকট্রিক অফিস। একতলায় বিল পেমেন্টের অনেক কাউন্টার, খুব ভিড়। দোতলায় বড় অফিস; সেখানে অনেক কর্মচারী কাজ করছেন। মাথার উপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। তারই এক পাশে ম্যানেজারের চেম্বার। বাইরে পিয়ন টুলে বসে খৈনি মলছিল। যেতেই দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বলল :

-"এপয়েন্টমেন্ট হ্যায়?"

আমরা পাত্তা দিলাম না। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লাম। বড় ঘর। মাঝে বিরাট একটা টেবিল, টেবিল ঘিরে কয়েকটি চেয়ার। ঘরের চারিদিকে অনেক আলমারি ফাইলে ঠাসা। ম্যানেজারের টেবিলে বেশ কয়েকটি ফাইল। একটি ফাইল খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। বয়স্ক ম্যানেজার বেশ সৌমকান্তি চেহারার মানুষ। আমরা ঘরে ঢুকতে এতজনকে একসাথে দেখে অবাক হয়ে তাকালেন। সাথে পিয়ন ঢুকে বলতে লাগলেন:

-"বাবুলোক বগর এপয়েন্টমেন্ট ঘুস গিয়া"।

ম্যানেজার বিরক্তি ভরা চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জানতে চাইলেন আমাদের আসার কারণ। আমরা বললাম:

- "কলেজ থেকে এসেছি, ব্যাপক লোডশেডিং, গরমে টিকতে পারছি না। কলেজ চলাকালীন যেন লোডশেডিং না হয়"।

ম্যানেজার এবার শান্ত গলায় বললেন:

- "দেখুন এই বিষয়টি আমরা দেখি না, গ্রিড অফিস থেকে অপারেট হয়। আপনারা সেখানে জানাতে পারেন"।

বলাবাহুল্য গ্রিড অফিস অনেক দূরে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অনুরোধ করলাম উনি যেন আমাদের হয়ে গ্রিড অফিসকে বলে একটা সুরাহা করেন। আপত্তি করলেন না, বললেন:

-"ঠিক আছে আমি এখনই ফোন করে জানাচ্ছি"।

ফোন করে কি সব কথাবার্তা বললেন। আমরা খুশি হয়ে ফিরে এলাম।

কিন্তু সুরাহা হল না। লোডশেডিং যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগল। কয়েকদিন পর ঠিক হল আবার যাবো। এমন সময় আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। নিখিল কি কারণে আমাকে বলেছিল, একদিন মা'কে নিয়ে ট্রেনে কোথায় যাচ্ছিল, খুব ভিড়, মায়ের জন্য একটা সিটের জন্য অনুরোধ করলেও কেউ ছাড়ল না অগত্যা নিখিল এক যাত্রী গায়ে হড়হড় করে বমি করে দিয়েছিল, পরে সিট বিলকুল ফাঁকা। প্ল্যান হল নিখিলকে নিয়ে যাব, সেই একই কাজ করে একই রকম কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

নিখিলের বায়না তাকে পেট ভরে ভাত খাওয়াতে হবে।কলেজের সামনের রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটা সাধারণ হোটেল ছিল, নিয়ে যাওয়া হল নিখিলকে। নিরামিষ খেলে খরচ কম হত কিন্তু নিখিল জানালো সে মাছ বা মাংস ছাড়া খেতে পারে না। মনে মনে বললাম "সেই তো গিয়ে বমি করবি তবে মাছ মাংস খেয়ে খরচ বাড়াচ্ছিস কেন"? অগত্যা নিখিলকে পেট পুরে মাছ, ভাত, ডাল, তরকারি, ভাজা সহযোগে পঞ্চব্যঞ্জন খাইয়ে এবার ইলেকট্রিক অফিসে যাওয়া হল। সোজা দোতলায় উঠে ম্যানেজার এর চেম্বার।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন:

- "কাজ হয়েছে তো"?

ওনার ওই মিচকে হাসি দেখে মাথায় রক্ত চড়ে যাবার জোগাড়।

-"আপনার গটআপ গেম আমরা বুঝে ফেলেছি। আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন"।

আরন সেন, নবম শ্রেণী

এই বলে চেঁচামেচি করে স্লোগান দিতে থাকলাম। উনি ভয়ে কেমন জড়সড় হয়ে গেছেন। মুখে কিছু বলতে পারলেন না। দেখলাম নিখিল পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমার ইশারা পেতেই আর দেরি না করে হড়হড় করে বমি করে দিল। আমার নির্দেশ ছিল টেবিলের ফাইলে বমি করা। অতি উৎসাহী হয়ে নিখিল টেবিলে তো করলই ম্যানেজারের গায়েও বমি করে ভাসিয়ে দিল। তুলকালাম বেঁধে গেল। অফিস ঘর থেকে অন্যান্য স্টাফরা ছুটে এলো। ওই অবস্থা দেখে সবাই হতভম্ব। বিরাট শোরগোল পরে গেল। পিয়ন কাঁন্নার সুরে চেঁচাতে লাগল

- "মার দিয়া রে, সাহাবকো মার ডালা"।

কলেজের এত ছাত্র দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস করল না। আমরা স্লোগান দিতে দিতে বেরিয়ে এলাম। "ম্যানেজারের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও..."

কলেজে ফিরে দেখলাম পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে আর কলে জলও পড়ছে । এরপর আর কখনো ওমুখো হতে হয় নি।

দূরভাষ

সৌম্য দাশগুপ্ত

ডঃ অনিকেত সেন। উনপঞ্চাশ বছর আগে মালদা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে আপাতত তিনি হাওড়া স্টেশনের এনকোয়ারি বুথের সামনে। সময় কীভাবে নষ্ট করতে হয়...বায়োকেমিস্ট ডঃ অনিকেত সেনের তা জানা নেই। আর এখন তাঁকে ঝাড়া এক ঘন্টা কিছু না করে সময় নষ্ট করতে হবে। খুবই বিরক্তির সাথে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনিকেত। প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সন্ধ্যে নয়... সকাল।

ডঃ মিতালি চ্যাটার্জি। আটচল্লিশ বছর আগে নাকতলা থেকে যাত্রা শুরু করে আপাতত সরাইঘাট এক্সপ্রেসের বি২ কোচের যাত্রী। বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে এসে ব্যাগ খুলে মোবাইলটা বার করে অনিকেতের নম্বরটায় এই নিয়ে তৃতীয় বার চেষ্টা করলেন। রসায়নের প্রফেসর বলেই হয়ত মিতালির একটা অনুসন্ধিৎসু মন আছে এবং তাঁর প্রিয়তম বিষয় হল 'মানুষ'। তবে আপাতত সেই মনকে বিশ্রামে রেখে অনিকেতের স্ত্রী মিতালি মন দিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়ের এক গোয়েন্দা উপন্যাসে। ওদিকে ভোরের আলো ফুটল বলে...।

সৃজন সেন। বছর ষোল আগে আমেরিকার নিউ হাভেন শহর থেকে যাত্রা শুরু করে আপাতত দিল্লি শহরে নিজের ঘরে তৃতীয় বার 'স্কাইফল' সিনেমাটা দেখে ল্যাপটপটা বন্ধ করল। ওর রুমমেট সাহিল তখনও ল্যাপটপে ঘাড় গুঁজে কলেজের প্রোজেক্টের কাজে ব্যস্ত। প্রোজেক্ট মানেজ করা ব্যাপারটা মিতালি-অনিকেতের একমাত্র পুত্র সৃজন ভালোই পারে - সেটা তার অভিনয়ের গুণেই হোক আর গুছিয়ে কথা বলতে পারার জন্যেই হোক। তাই সাহিলকে গুড মর্নিং বলে ঘুমোতে গেল সৃজন।

****

হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লেন অনিকেত। মিতালিকে একবার ফোন করার চেষ্টা করলেন কিন্তু পেলেন না। আজ মিতালি মাস ছয়েক বাদে কলকাতায় আসছেন। গেলবার এসেছিলেন সেই মে মাসে ওদের সেমেস্টার ব্রেক ছিল তখন। অবশ্য অনিকেত তখন আবার ব্যস্ত ছিলেন একটা সেমিনার নিয়ে। এবারে আশা করা যায় সেরকম কোনও ব্যস্ততা নেই। তবে বেসরকারি চাকুরেদের জীবন ... কিছুই বলা যায় না। অবশ্য সময় দিতে না পারার জন্য মিতালি কিছুই বলেননি। বন্ধু বান্ধব, ওর মামার বাড়ি নিয়ে দিব্যি সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে ফিরে গেছিলেন গৌহাটি। কোনও ফালতু অভিমানে মিতালি নেই --- সেটা অনিকেত ভালোই জানেন। বরং যাওয়ার আগের দিন অনিকেতের সাথে বসে বেড়ানোর প্ল্যান করেছিলেন মিতালি - প্রথমে দিল্লি --- তারপর সেখান থেকে সৃজন কে নিয়ে কিন্নর কল্পা। দিন ছয়েকের প্ল্যান ...। এই আগামীকাল বেরনোর কথা ছিল। সেই জন্যেই এবার মিতালির আসা।

তবে সে প্ল্যান হচ্ছে না। গত কাল দুপুরে সৃজন জানায় ওর হবে না, কলেজে প্রোজেক্ট আছে এবং তারপর কিছু অ্যাসাইনমেন্ট । এদিকে প্রায় সব ব্যবস্থা পাকা--- ফ্লাইটের টিকিট, হোটেল সব ক্যান্সেল করেছেন অনিকেত। মিতালিকে যখন জানান অনিকেত তখন উনি ট্রেনে। বোঝা গেল মুষড়ে পরেছেন ...... তবে অনিকেত জানেন মিতালি কলকাতায় এলে সব ভুলে দিব্যি এক সপ্তাহ কাটিয়ে ফেলবেন। মুস্কিল তা হচ্ছে অনিকেতের নিজের। ডঃ সেন যে আগামী কয়েকদিন নেই সেটা প্রায় সকলেই জানে। ম্যানেজমেন্ট প্রথমে ছুটি দেয়নি শেষে ছেলের অসুস্থতার কথা বলার পর ছুটি মঞ্জুর হয়। তিনি নিজে যে নিজে বেড়াতে যেতে খুব একটা চেয়েছিলেন তা নয়........ তবে কিছুটা সৃজনের জন্যই...। ছেলেকে বড্ড ভালবাসেন অনিকেত। ম্যানেজমেন্টকে এখন কী বলবেন সেটা ঠিক ভেবে উঠতে পারেননি অনিকেত।

আপাতত অনিকেত গঙ্গার ধারে...... হাওড়া ব্রিজের আলোগুলো এখনও নেভেনি। ছবি তোলার একটা নেশা এককালে অনিকেতের ছিল...। ধর্মতলার ক্যামেরার দোকানগুলোতে নিয়মিত যাতায়াতও ছিল ওঁর। তবে শেষ কবে ছবি তুলেছেন মনে করতে পারলেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে দিন চলে অনিকেতের ---- সকাল থেকে রাত ---- আবার রাত থেকে সকাল --- বিরামহীন। গতকালও অফিস থেকে যখন বাড়ি ঢোকেন তখন রাত ৮ টা। মোবাইল দেখার সময় কোথায়? টুং করে একটা মেসেজের আওয়াজে সম্বিত ফিরল অনিকেতের। মোবাইলটা বুক পকেট থেকে বের করলেন। কোনও এক শপিং মলে ৪০% ছাড় দিচ্ছে। বিরক্তিটা বেড়ে গেল অনিকেতের। মোবাইলটা বন্ধ করতে যাওয়ার সময় মেসেজ বক্সের তিন নম্বর মেসেজটার দিকে চোখ গেল অনিকেতের। একটা অচেনা নম্বর। ভাষাটা বাংলা তবে অক্ষরগুলো ইংরেজি - কেবল একটা লাইন লেখা ---- 'তোকে কি আমি একটা ফোন করতে পারি?' তলায় লেখা ---- 'বাবলু'। ক এক সেকেন্ড মেসেজটার দিকে চেয়ে রইলেন অনিকেত ----- বা বলা ভালো ওই 'বাবলু' শব্দটার দিকে। 'বাবলু' নামে কাউকে চেনেন অনিকেত? একবার মনে পড়ল ওনার অফিসের তলার চা এর দোকানের ছেলেটার নাম মনেহয় 'বাবলু'। কিন্তু সে অনিকেতকে এই ভাবে মেসেজ করবে কেন? আর একবার মেসেজটা দেখলেন অনিকেত। মেসেজটা এসেছে গতকাল রাত ১১.২৩ এ। মানে তখন অনিকেত ঘুমিয়ে পরেছিলেন। 'বাবলু'...... 'বাবলু'...... নামটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল অনিকেতের। এমন কোন 'বাবলু' আছে যে তাকে 'তুই' বলতে পারে? 'তুই' বন্ধু দের সঙ্গে তো কবেই যোগাযোগ শেষ হয়ে গেছে ---- দু একজন আছে তবে তারা সবাই বিলেতে। এবং তাদের নাম 'বাবলু' নয়। হঠাৎ মনে হলে বেকার এত ভাবছেন একটা ফোন করলেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই বোতামে চাপ দিলেন। বেশ কয়েকবার রিং হয়ে গেল --- কিন্তু ফোন টা কেউ ধরল না। মরিয়া ভাবে আর একবার করলেন কিন্তু এবারেও একই ফল। দমে গেলেন অনিকেত। মেসেজের রিপ্লাই দিলেন 'ডু আই নো ইউ?'

****

স্নান সেরে মিতালি যখন বেরল তখন ঘড়িতে ৯:২০। অনিকেত তখন খবরের কাগজের পাতা ওলটাচ্ছেন। আজ রবিবার -- তাই অফিস ছুটি।

মিতালি- 'সৃজন আর ফোন করেনি তোমাকে?'

অনিকেত- 'নাহ। গতকাল দুপুরবেলাতে ফোন করে খবরটা দিল। তারপর তো আর করে নি।'

মিতালি- 'সব ক্যানসেল করে দিয়েছ?'

অনিকেত- 'হ্যাঁ...। সেসব হয়ে গেছে। গত কাল সন্ধ্যে বেলাতে ফিরে করলাম।'

মিতালি- 'কলেজগুলোর একটা অ্যাকাডেমিক প্ল্যান থাকা উচিত। এই ভাবে কেউ প্রোজেক্ট সাবমিশনের ডেট দেয়?'

মিতালির খারাপ লাগাটা অনিকেত বোঝেন। মিতালি বেড়াতে চিরকালই ভালবাসেন। অবশ্য সেটা অনিকেতও ভালবাসেন......তবে ইদানীং সৃজনের পড়াশুনো আর নিজেদের কাজের চাপে বছর দুয়েক বেড়াতে যাওয়া হয়নি। পোস্ট গ্রাজুয়েশন পাশ করে অনিকেত আমেরিকায় যান পি এইচ ডি করতে তখন সালটা ১৯৯৫। মিতালির সাথে আলাপ ওখানেই। মিতালিও তখন পি এইচ ডি করছেন। নিউ ইয়র্ক শহরের এক বাস স্ট্যান্ড থেকে দুজনের পরিচয়......সেই থেকে প্রেম। তারপর ১৯৯৮ এ দেশে ফিরে বিয়ে এবং আবার আমেরিকা গমন। এবারে নিউ হাভেন শহরে। সৃজনের জন্ম ওখানেই।

অনিকেত- 'সে আর কি করা যাবে? তা তুমি কি ডিপ্রেসড হয়ে পরলে নাকি?'

মিতালি মুচকি হেসে বলল--- 'সে আমি না তুমি...? সামনের সাতদিন ছুটি নিয়ে বসে আছ। ছেলের শরীর খারাপ কোন জাদুবলে সেরে গেল...... কি বলবে অফিসে?'

অনিকেত- 'সেটাই তো ভাবছি'।

মিতালি জানেন অনিকেত নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ওর ছুটি নিয়ে অফিসে কোনরকম কুটকাচালি ও চায় না। এদিকে বাড়িতে বসে থাকার লোক ও নয়। মিতালি একেবারে উল্টো। কে কী ভাববে সেই নিয়ে মিতালি কোনদিনই বিশেষ ভাবেননি। তাই ছোট্ট সৃজন কে বাপের বাড়িতে রেখে উড়িষ্যার প্রথম চাকরিটাতে জয়েন করার সিধান্ত নিতে মিতালির সময় লেগেছিল বড়জোর দশ মিনিট। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বছর পাঁচেক মিতালি কোনও অ্যাপ্লাই করেননি। তারপর করেছেন এবং চিন্তা ভাবনা করেই করেছেন। ছোট থেকে সৃজনকেও তৈরি করেছেন সেই ভাবেই। পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবকিছু.........প্রত্যেকের জীবনের মূল্যবোধ। অনিকেতও সেটাকে মর্যাদা দিয়েছেন...... তবে ছেলের ব্যাপারে অনিকেত একটু বেশিই আতুকে। সৃজনকে দিল্লি পাঠানোর সিধান্তটা পুরোপুরি মিতালির......অনিকেত তাতে সায় দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু মিতালি জানেন যে ছেলেকে কাছে রাখতে পারলেই অনিকেত খুশি হতেন বেশি। ছেলের প্রতি মিতালির কোনও বাড়াবাড়ি সুলভ ন্যাকামি নেই। লুচি তরকারির প্লেট অনিকেতকে দিয়ে নিজে নিয়ে বসলেন মিতালি। মোবাইল হাতে নিয়ে সৃজনকে ফোন করলেন। টুকটাক কথা বলে ফোনটা অনিকেতকে চালান করে দিয়ে আবার লুচি তরকারিতে মন দিলেন। মিনিট দশেক বাদে অনিকেত প্লেট রাখতে এসে মিতালিকে বললেন "তোমার ছেলে এখন সরেস হয়েছে। বলে কিনা যাও দ্বিতীয় হনিমুনটা সেরে ফেল। ছুটিটা ক্যানসেল কোর না।"

****

মেসেজটা এলো তার একটু পরেই। মেসেজটার কথা বেমালুম ভুলে গেছিলেন অনিকেত। এবারেরটা আগেরবারের মতই - "সরি ঘুমচ্ছিলাম। তাই তোর ফোন ধরতে পারিনি। ফ্রি থাকলে জানাস।" সকালের সেই অস্বস্তি টা ফিরে এলো অনিকেতের। মরিয়া হয়ে বোতাম টিপলেন ---- ওপাশে রিং হচ্ছে। যে গলাটা শুনলেন সেটা খ্যানখেনে...এক বয়স্ক লোকের।

অনিকেত প্রথমেই বললেন 'আমি কি আপনাকে চিনি?'

ক এক সেকেন্ড চুপ থাকার পর্ব ওপাশের গলা উত্তর দিল 'গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠ মনে আছে?'

গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠ মানে হরিশ্চন্দ্রপুরের অনিকেতের ছোটবেলার স্কুল... যেখানে উনি মাধ্যমিক অবধি পড়েছেন। অনিকেত উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ... কিন্তু আপনাকে তো ঠিক...।'

ফোনের ওপার কণ্ঠ উত্তর দিল 'আর... বাবলু কে ভুলে গেলি।'

অনিকেত খুব কষ্ট করেও কোনও বাবলুকে মনে করতে পারলেন না। বললেন 'না ঠিক মনে পড়ছে না তো ...।'

খ্যানখেনে গলায় হাল্কা একটা হাসি শুনলেন অনিকেত। তারপর শুনলেন 'আচ্ছা লোথার কেও ভুলে গেলি তুই?'

বিদ্যুৎ গতিতে অনেককিছু মনে পরে গেল অনিকেতের। লোথার, মানড্রেক, বাহাদুর আর বেতাল --- এই চারজনের মধ্যে অনিকেত ছিলেন 'বাহাদুর' আর বাকি তিনজন মানে বাদল ছিল 'বেতাল', আলম ছিল 'মানড্রেক' আর 'লোথার' ছিল পুলক। ধাঁ করে চারপাশটা কি রকম এক মুহূর্তে বদলে গেল অনিকেতের। চিৎকার করে বলে উঠলেন 'পুলক?' পুলকের ডাকনাম যে বাবলু সেটা মনেই ছিল না।

ওপাশের হাসিটা আর একটু বাড়ল। বলল - 'হ্যাঁ রে ব্যাটা...।'

অনিকেত বললেন 'তা এত ভণিতা কেন রে। সোজাসুজি ফোনই তো করতে পারতিস। কোথায় আছিস তুই ?'

পুলক বলল 'ভণিতা নয় রে...। তোর সম্বন্ধে কিছু দিন আগেই জানলাম এক জনের থেকে। জানলাম তুই এখন বিশাল ব্যস্ত। তাই একটু জিগ্যেস করে নিলাম আর কি? অবশ্য তার একটা অন্য কারণও আছে।'

'কি কারণ রে'--অনিকেত শুধল।

'সে অনেক কথা......আগে বল আছিস কেমন। ওঃ... প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ বছর পরে কথা হল তোর সাথে।' পুলকের উত্তেজনাটাও টের পাচ্ছিল অনিকেত।

'তুই আছিস কোথায়?' - অনিকেত জানতে চাইল।

'আমি ভিলাইতে থাকি...। নিজের ব্যাবসা...। আমার দুই মেয়ে আর এক বৌ......। হা হা । তবে আপাতত আমি কলকাতায়।'

'বলিস কি রে ...... কলকাতায়? তা চলে আয় আমার বাড়ি। আড্ডা মারা যাবে।'

'না রে । সেখানেই তো প্রব্লেম। আজ সারা দিন ব্যস্ত থাকব এই ব্যাবসার কাজে...। বুঝিসই তো জি এস টি-র জমানা। তবে একটা প্ল্যান আছে। সেই জন্যেই তোকে ফোন করছি।'

'প্ল্যান? কী প্ল্যান?'

'বলছি... দু তিন দিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারবি? এই সামনের বৃহস্পতিবার অবধি।'

'কেন বল তো?' -- অনিকেতের গলায় প্রশ্ন।

'বলছি... হরিশ্চন্দ্রপুর যাবি? মানড্রেক ও আসবে। দিন দুয়েক কাটিয়ে চলে আসব।'

'অ্যাঁ...... মানে? কি বলছিস তুই? মানড্রেক? সে কোথায়?' বিস্ময়ের ঘোর কাটে না অনিকেতের।

'বলব...। সব বলব। যাবি তো? না করিস না।' পুলকের নাছোড় আবদার।

'আর বাদল? আমাদের বেতাল বাবু?' অনিকেত শুধলেন তার প্রিয় বন্ধুকে।

'ওহ বাদলের খবরটা জানিস না তুই? " -- পুলক একটু বিচলিত।

'না। আমি কিছু জানি না। কেন কি হয়েছে বাদলের?' অনিকেত উতলা।

'বাদল বাঙ্গালোরে ছিল রে। বছর চারেক আগে এক রোড অ্যাক্সিডেন্টে......'।

'কী ....' চিৎকার করে উঠলেন অনিকেত। মিতালিও ছুটে এসেছে। এসে দেখেন অনিকেত ফোন হাতে থর থর করে কাঁপছেন। চোখের ইশারায় জিগ্যেস করল মিতালি।

অনিকেত মিতালিকে হাত নেড়ে এক গ্লাস জল দিতে বললেন।

'তাই তো বলছি রে... । বয়স তো আমাদেরও হয়েছে...। দেখ...... এটাই হয়ত আমাদের শেষবারের যাওয়া......। তাই বলছি... 'চল'। জানি তুই ব্যাস্ত মানুষ। তোর হয়ত একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু অসুবিধে করেই না হয় গেলি...। বাদলের খবরটা পাওয়ার পর থেকেই কেন জানিনা মনে হচ্ছে একবার হরিশ্চন্দ্রপুর যাব। গত দু বছর আগে এক সহকর্মীর মারফত আলমের সাথে যোগাযোগ হয়...। আর এই সেদিন তোর সন্ধান পাই। তখনই ভেবেছি আমরা তিন জন মিলেই যাব। অন্তত একবার...।' ---এক নিশ্বাসে কোথা গুলো বলে গেল পুলক।

মিতালির দেওয়া জলটুকু শেষ করে একটু বল পেলেন অনিকেত। বললেন -- 'কবে যাওয়া?'

'আজ রাতে। ৮:৫০ এ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস। শিয়ালদহ থেকে। আলম এখন বিহারে থাকে ---- ভাগলপুরের কাছে। ও ওদিক থেকে আসবে। আগামী কাল সকালে আমরা তিনজন হরিশ্চন্দ্রপুরে......বুঝলি......।' পুলক যেন মরিয়া।

'টিকিট'? অনিকেত জানতে চাইলেন।

'ধরে নে নেই... । জেনারাল কামরায় যাব। তবে তোর কেউ চেনা থাকলে তৎকাল এ দেখতে পারিস।'

এতক্ষণে সম্বিত ফিরেছে অনিকেতের। বললেন 'দাঁড়া দাঁড়া। তোর তাড়াহুড়ো বাতিকটা যায়নি দেখছি। তোকে আমি একটু পরে ফোন করছি।'

'যাবি তো?' পুলক জানতে চাইল।

'দাঁড়া তুই...। আমি ফোন করছি তোকে' --- বলে ফোনটা রাখলেন অনিকেত। মিতালি তখনও পাশেই বসে।

অবাক করা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মিতালি। জিজ্ঞেস করল 'শরীর খারাপ লাগছে? কি হয়েছে? কার ফোন?' একে একে মিতালির প্রশ্ন গুলোর জবাব দিলেন অনিকেত। মিতালিকে অনিকেত হরিশ্চন্দ্রপুরের কথা বললেও ওই ইন্দ্রজাল কমিকস এর চার বন্ধুর কথা আগে কোনদিন বলেন নি। মিতালিকে ফোনের ঘটনাগুলো বলতে বলতে অনিকেত মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন...। বিশেষ করে বাদলের কথাটা বলতে গিয়ে গলাটা একটু ধরেই গেছিল। সবকথা ধৈর্য ধরে শুনল মিতালি। শেষে জিগ্যেস করল 'যাবে নাকি তুমি?'

****

হরিশ্চন্দ্রপুর নামটা কতদিন পরে কানে পড়ল অনিকেতের। ওখানকার গাছ পাথরের মধ্যেই তো অনিকেতের ছেলেবেলা কেটেছে। গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল বিদ্যাপীঠ - মানে তো সেই অবিনাশ বাবুর বেতের বাড়ি, গোস্বামী বাবুর বাংলা ক্লাস, হেড মাসটার সুধন্যকান্তি দাসগুপ্তের চকচকে টাক, গেটের বাইরের কুলফি-হজমি, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' ----- আরও কতও কি। মাস্টার মশাইরা কি এখনও আছেন ওখানে? দেখা হলে কি এখনও ইতিহাসের স্যার ভবানী বাবু 'কি হে ছোকরা' বলে উঠবেন? ভদ্রলোকের পেয়ারা ডালের বেতের কথা ভালোই মনে আছে অনিকেতের। আর ওদের ওই চার মগজের ইদ্রজাল??? আলম তাসের ম্যাজিক শিখেছিল ওর মেজমামার কাছ থেকে তাই ও মানড্রেক, পুলকের চিরকালই দশাসই চেহারা --তাই ও ছিল লোথার। বাদলের একটা মুখোশ ছিল আর কোথা থেকে একটা আংটি জুটিয়েছিল --- তাই ও ছিল বেতাল। কিন্তু অনিকেতের নিজের নামটা কেন বাহাদুর হয়েছিল সেটা অনেক ভেবেও মনে করতে পারলেন না। এই চার মগজের প্রিয় একটা খেলা ছিল 'টিপ দ্য ট্রেন'। মানে আলজমি থেকে কাদার গোল্লা পাকিয়ে ট্রেনের জানলা তাক করে ছোঁড়া। সবথেকে এই খেলায় ভালো ছিল বাদল। তবে ব্যাপারটা একবার ওই ভবানী বাবুর চোখে পরে এবং তার পর ওই পেয়ারা ডালের বেত.........। আজও পিঠের ব্যাথাটা টের পেলেন অনিকেত।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মিতালি। বলল 'কি ঠিক করলে? যাবে?' অনিকেত দড়াম করে বিছানায় একটা ঘুষি মেরে বললেন 'যাব'। তুমি জানো মিন্টি............এই ব্যাটা পুলক প্রত্যেকবার দুর্গা পুজোর ভাসানে কপালে ইয়া বড়ো একটা তিলক কেটে নাচতে নাচতে যেত এবং প্রত্যেকবার নতুন জামা কাপড়ে কাদা মেখে বাড়ি ফিরত। আর ওই আলম ---- একটু ট্যারা ছিল ---- আর সেই সুযোগে পরীক্ষার হলে বেমালুম টুকত পাশের জনের খাতা থেকে ---- ওকে ধরে কার বাপের সাধ্যি। আর ওই বাদল............।' বলেই যাচ্ছিলেন অনিকেত।

অবাক হয়ে মিতালি দেখছিলেন এই মানুষটাকে। আজ প্রায় উনিশ বছর বিয়ে হয়েছে ওদের। কিন্তু এই মানুষটাকে আজ যেন প্রথমবার দেখছেন মিতালি। নিউ ইয়র্কের প্রথম দিকে হয়ত কিছুটা এমন দেখেছিলেন --- কিন্তু তারপর থেকে কেরিয়ার, টাকা, দায়িত্ব, ছেলে, অফিসের প্রমোশন, ফ্ল্যাটের ই এম আই - সব মিলিয়ে মানুষটা কেমন যেন 'অতি সাবধানী' হয়ে উঠেছিল। শেষ কবে মন খুলে অনিকেতকে হাসতে দেখেছেন মিতালি --- জানেন না। মিতালিকে কোনদিন জোর করে বাধা দেননি অনিকেত। মিতালির উড়িষ্যার

ধ্রুপদ চট্টোপাধ্যায়

চাকরি, গৌহাটির চাকরি, সৃজনকে ওর মামারবাড়িতে মানুষ করার সিধান্ত -- কিছুতেই বাধা দেন নি। কিন্তু সেই অনিকেত আজ বেশ অন্যরকম......। অনেকটা সেই পুরনো নিউইয়র্কচিত 'অনি'-র মতন... যে 'অনি' ওদের দুজনের ডে আউটগুলোতে 'বব ডিলান থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়' বা 'মোহনবাগান থেকে এ সি মিলান' নিয়ে অনর্গল কথা বলত আর ফি মাসে একটা করে রোড ট্রিপ আর ফি উইক এন্ডে বাঙ্গালী খাবার না হলে ছেলেমানুষের মতো গোঁসা করত মিতালির (থুড়ি মিন্টির) কাছে। অনেকদিন বাদে নিউইয়র্কের রাস্তায় 'হেঁটে' এলেন মিতালি।

অনিকেতকে থামিয়ে বললেন 'যাবে যখন... তাহলে জানিয়ে দাও। আর পুলকবাবুর নাম বয়সের ডিটেলসটা নিয়ে নিও। ছোড়দার একজন চেনা ট্রাভেল এজেন্ট আছে। কোন ট্রেনে যাবে? দেখি উনি তৎকালে টিকিটের ব্যাবস্থা করে দিতে পারেন কিনা'? এক লাফে অনিকেত বিছানা ছেড়ে উঠে মিতালির গালটা টিপে দিয়ে বললেন 'জো হুকুম ম্যাডাম'।

শেষ অবধি সেই ট্রাভেল এজেন্ট টিকিটের ব্যাবস্থা করে দিয়েছিলেন। মিতালির কাছে যখন এস এম এস টা আসে ততক্ষণে অনিকেত ট্যাক্সি নিয়ে শিয়ালদার পথে। এস এম এস টা অনিকেতকে ফরওয়ার্ড করে দিল মিতালি। এক মিনিটের মধ্যে এক গুচ্ছ স্মাইলি সহ মিতালি (থুড়ি মিন্টি) যে এস এম এস টা পেল সেটার কথা না হয় উহ্যই থাক। মুচকি হেসে সৃজনের নম্বরে চাপ দিলেন মিতালি।

****

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। শেষ হলেও কিছু বলার ছিল না। তবে পাঠককুলের জন্য কয়েকটা খবর দেওয়া দরকার।

প্রথমত পুলকবাবুর ব্যবসা ল্যাব ইন্সট্রুমেন্টের। সেই সুবাদেই তার মিতালির গৌহাটির কলেজের রসায়ন বিভাগে আগমন এবং মিতালির সাথে আলাপ। কথা প্রসঙ্গে আসে হরিশ্চন্দ্রপুরের কথা... অনিকেতের কথা। ঘটনাটা মিতালির কলকাতায় আসার দুদিন আগে। দ্বিতীয়ত মিতালি যে অনিকেতের স্ত্রী সেটা জানবার পর পুলকবাবু ওই চার মগজ ইন্দ্রজালের কথাও বলেন। এটাও জানান যে আগামী রবিবার তাদের মধ্যে দুই মগজের হরিশ্চন্দ্রপুর যাওয়ার কথা। আইডিয়াটা তখনই মিতালির মাথায় আসে। অনিকেতের ফোন নম্বর মিতালিই দেয় পুলকবাবুকে......তবে ফোন নম্বরের উৎস গোপন রাখতে বলে। মিতালি জানতেন যে 'কিন্নর-কল্পা'র প্ল্যান ক্যানসেল করে হরিশ্চন্দ্রপুর যেতে 'অনি'-র না বাধলেও 'অতি সাবধানী' ডঃ অনিকেত সেনের বাধবে। সৃজন আর মিতালির কথা ভেবেই উনি অবলীলায় পুলকবাবুকে 'না' বলে দেবেন - সেটা মিতালি বিলক্ষণ জানতেন। তাই মিতালি পুলকবাবুকে এটাও বলে দেয় শনিবার রাতে বা রোববার সকালের আগে যেন উনি অনিকেতকে ফোন না করেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের টিকিটের কথা ছোড়দার ওই বন্ধুকে আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিল মিতালি। আর শনিবার দুপুরে প্রোজেক্টের বাহানা দিয়ে অনিকেতকে ফোন করে কিন্নর কল্পার প্ল্যান ভেস্তে দেওয়ার কাজটা নিপুণ ভাবে করে সৃজন। ছেলেকে ম্যানেজ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি মিতালির ---- উলটে সৃজন বলেছিল 'মা......দিস ইস আ লাইফ টাইম অপরচুনিটি ফর বাবা...... বাবা শুড নট মিস ইট।'

কোথাও একটা নিজের ছেলের ওপর বেশ গর্ব অনুভব করেছিলেন মিতালি.......... কাছে পেলে হয়ত জড়িয়েই ধরতেন।

বদল রহস্য ও রঞ্জুদার হার:

ভাস্কর দাশগুপ্ত

‘কিরে, মন খারাপ নাকি?’ মোটা ফ্রেমের চশমাটা নামিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল রঞ্জুদা।

তোতনের আজ সত্যিই মনটা খারাপ। সকাল থেকে বৃস্টি, মাঠভর্তি কাঁদা, আর এমনিতেও বাড়ীতে বড়জেঠু এসেছে। বড়জেঠু বেশ রাগীপ্রকৃতির মানুষ, বারান্দায় সকাল থেকে খবরের কাগজে মুখগুজে বসে থাকলেও শ্যেণদৃস্টি রাস্তার দিকে। সেটা পেরিয়ে বেরিয়ে আসাটাই বেশ ঝক্কির ব্যাপার। সে যাই হোক, সে সব পেরিয়ে তোতন গোলপার্কের দিকে হাটা দিয়েছে বেশ খানিক আগে। বিল্ব মানে বিল্লু computer কিনেছে, সেটা দুজনে মিলে একটু নেড়েচেড়ে দেখা আর কি।

তোতনের বড়জেঠু থাকে বিহারে পাটনায়, বেশ বড় পোস্টেই চাকরি করে অবসর নিলেও পাটনা ছাড়েননি। কিন্তু দূর্গাপুজার আগে কলকাতার ভাইয়ের বাড়ীতে আসেন মহালয়ার আগে, কাল মহালয়া, তর্পন। সাতদিন এখানে থেকে তারপর সবাই মিলে বর্ধমান, আদিবাড়ীতে। তা তোতনের দূর্গাপুজাটা এবারেও বর্ধমানেই কাটবে। তর্পন ব্যাপারটা তোতন ভাসাভাসা যেটুকু বোঝে তা ওই পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাঞ্জলী দেয়া হয়, বাবা আর জেঠু গঙ্গায় গিয়ে করে আসে। তবে কোথাও একটু দুঃখদুঃখ ভাবনা জরিয়ে আছে এটাতেও। এই বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়াটা নিয়ে কৌতুহল আছে তোতনের, তবে এনিয়ে বাড়ীতে জিজ্ঞেস করা যায়না।

‘মানুষ মরে যায় কেন, আর বেঁচেই বা থাকে কেন?’ তোতন জিজ্ঞেস করেই ফেলে রঞ্জুদাকে।

‘অ্যাঁ’, অবাক হয়ে হাতের বইগুলো সরাতে সরাতে বলে রঞ্জু, ‘হঠাৎ এই প্রশ্ন?’ গাদা বই একত্র করতে হবে আজ রঞ্জুদাকে, delivery আছে কাল, পুজোর আগের প্রত্যাশিত টলিপাড়ার ব্যস্ততা।

‘এটা বলতে পারব না’, বলল রঞ্জুদা, ‘বরং আমি তোর এই প্রশ্নটা একটু interesting করি, যদি জিজ্ঞেস করি আমার মধ্যে আমি কতটা বেঁচে আছি’।

‘এ আবার কি বিতিকিচ্ছিরি প্রশ্ন?’ তোতন অবাক, ‘তুমি আবার কি একটা কঠিন জিনিস নিয়ে এলে’।

‘তুই যা আগে জিজ্ঞেস করলি সেটার কাছে তো এটা শিশু। আচ্ছা ধাপে ধাপে যাই বরং, তোর তো এখন ক্লাস এইট, ব্যাকটেরিয়া জানিস, বলতো ব্যাকটেরিয়া কি জীবন্ত?’

– ‘ব্যাকটেরিয়া? জীবন্তই তো জানি?’

– ‘কেন?’

– ‘জানি না। বইতে লেখা আছে।’

– ‘ধ্যুস্।’

– ‘আচ্ছা, তুমি বল।’

– ‘দ্যাখ, ব্যাকটেরিয়া জীবন্ত কারন ওরা উত্তেজনায় সারা দেয়, একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা জন্মাতে পারে। ওদের কোষে সেইরকম সরঞ্জাম আছে।’

– ‘সেইরকম সরঞ্জাম না থাকাতেও কোনো জীব আছে নাকি?’

– ‘আমাদের শরীরের লোহিত রক্তকণিকা, একটা থেকে আরেকটা হতে পারে না।’

– ‘ও। এরকম ব্যাপার। যদি সেটা হয়ও, ওটা তো আর পুরো আমিটা নয়, একটা অংশমাত্র।’

– ‘তাহলে দাড়াল, তোর শরীরের কিছু কোষ জীবন্ত না হলেও তুই তোর শরীরের কোটিকোটি কোষের পুরোটা মিলে জীবন্ত।’

– ‘হুমম্।’

– ‘এখানেই শেষ নয়। তোর এই সব কোষের অধিকাংশই কিছুদিনই মাত্র বাঁচে, তারপর নতুন কোষ দিয়ে প্রতিস্হাপিত মানে replaced হয়ে যায়। তবে এটার একটা অন্য মানেও দাড়াতে পারে।’

– ‘কি মানে?’

– ‘ধর একটা বাড়ী, তার প্রতিটা ইট তুই দিনে একটা করে বদলে দিচ্ছিস একদম অবিকল আরেকটা ইট দিয়ে। এই করে করে বাড়ীটার সব কটা ইটই একদিন বদলে গেল, তাহলে সেটা কি আগের বাড়ীটাই রইল, নাকি এটা নতুন একটা বাড়ী?’

– ‘অ্যাঁ? তাহলে তো এটা নতুন একটা বাড়ী।’

– ‘বটে। তবে তোর কাছে বাড়ীর ধারনাটা কি কতগুলো ইটের যোগফল, যেখানে প্রতিটা ইট তার নিজস্ব স্বত্তা নিয়ে উপস্হিত?’

– ‘একটা বাড়ীতো ইট দিয়েই তৈরি।’

– ‘তাহলে তোর ভাবনা গ্রীক দার্শনিক হেরেক্লিটাসের মত, যে একটা বয়ে যাওয়া নদীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, একই নদীতে দুবার নামা সম্ভব নয়, কারন জলটা তো প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।’

– ‘না, দাঁড়াও, গুলিয়ে দিও না। নদীটা তো শুধু জল নয়, জল, নদীর পাড়, পাড়ের গাছপালা পুরোটা নিয়ে নদী। পুরোটা তো আর বদলে যাচ্ছেনা।’

– ‘তাহলে বাড়ীর ব্যাপারটা কি হবে। অথবা জাপানের ইসে মন্দিরের ব্যাপারটা, যেটা জাপানের লোকেরা প্রায় গত দেড়হাজার বছর ধরে একই রকম করে নতুন করে রেখেছে, সব সময় যেটুকু নস্ট হয় সেটা বদলে দেয়, যার ফলে এখন আর পুরোনো মন্দিরের কোন অংশই নেই।’

– ‘আচ্ছা, এটা দুরকমই হতে পারে, যদি আমি বাড়ীটা বা মন্দিরটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকি তবে আমি দেখতে পাবো কিকরে পুরোটা একটু একটু করে বদলে নতুন হয়ে গেল, কিন্তু আমি যদি একবার দেখে চলে যাই, আবার এক বছর পর দেখি তাহলে আমি আর আলাদা করতে পারবো না কোথায় বদলে গেল, তখন আমার কাছে ওটা আগের বাড়ীটাই থাকবে।’

– ‘বাহ্। এবার তোর নিজের শরীরের কথা ভাব, এর অধিকাংশই কিন্তু আর ১০ বছর আগের অংশটা নেই। তাহলে তুই কে? তোতন? না ১০ বছর আগে তোতন ছিলি, এখন অন্য কেউ?’

– ‘যাহ্। আমিই তোতন, বরাবর। আমি তো আর খেয়াল করছি না, যে আস্তে আস্তে কিছু কোষ বদলে যাচ্ছে। এটা যে হয় তাতো সকালেও জানতাম না।’

– ‘সুতরাং, সবই খেয়াল করার ব্যাপার। আচ্ছা, যদি এই বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা না থাকত।’

- ‘আমিও সেটাই ভাবছিলাম রঞ্জুদা। এত হাঙ্গামা করার কি দরকার ছিল।’

- ‘কারন, প্রায় সব রকম কোষেরই একটা expiry date আছে। এই এখন আমার সাথে কথা বলার সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকশো কোষ মারা গেছে, সেগুলোর জায়গায় নতুন কোষ আসতে হবে তো।’

- ‘আচ্ছা এই ভাবেই কি আমরা ছোট থেকে বড় হই, মানে অনেক নতুন কোষ বানিয়ে?’

- ‘হ্যা। কিন্তু আরোও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই মুহূর্তে আমাদের শরীরে জীবন্ত আর অ-জীবন্ত মানে living আর non-living এর পরিমান কতটা?’

- ‘মানে ওই মরে যাওয়া কোষগুলো, সে আর কতটা হবে। আচ্ছা তাই তো। ওই কোষগুলো যাচ্ছে কোথায়?’

- ‘মরে যাওয়া কোষগুলো প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহ থেকে খসে পরছে, যখন তুই হাঁটছিস, খেলছিস, প্রতিদিনের প্রাত্যহিক কাজকর্ম করছিস তখন ওগুলো খসে পরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু শুধু ওই মরে যাওয়া কোষ নয়, সাধারণ অর্থে জীবন্ত নয় এরকম কোষের সংখ্যাও প্রচুর। যেমন ধর তোর লোহিত রক্ত কণিকা, ওর মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ কোষের অনেক অংশই নেই। এছাড়াও শরীরের অনেকটা শুধু জল, বা হাড়, বা চুল, বা নখ, এগুলোকেও ঠিক জীবন্ত বলা যায় না।’

- ‘এর আর পরিমান কতটা?’

- ‘দেখ একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে শতকরা ১ ভাগ প্রতিদিনই বদলে নতুন কোষ জন্মায়। মানে সে ভাবে চললে ১০০ দিনের মধ্যেই সবটুকু বদলে যেত। তা হয় না, কারণ বিভিন্ন কোষের expiry date আলাদা। যেমন মাথার স্নায়ুকোষ বা হার্ট – এগুলো বদলে যায় না। তবে ওই ১০০ দিনের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি পরিমান কোষ মরে যায়, এর বেশিরভাগটাই হল ওই লোহিত রক্ত কণিকা। আমাদের শরীরে বর্তমান ৩০-৪০ ট্রিলিয়ন কোষের মধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ত্বকের কোষ প্রতিদিন নস্ট হয়ে যায়। একজন মানুষ তার জীবনকালে যত পরিমান ত্বকের কোষ বদলে ফেলে তা প্রায় ১০০০ টা মানুষের ত্বকের সমান।’

- ‘বোঝো কান্ড। তাহলে আর কতটুকুই বা পড়ে থাকে জীবন্ত কোষ হিসেবে।’

- ‘তাও কোনো এক সময়ে অনেকটাই থাকে, কিন্তু important হল এই যে আমরা নিজেদের জীবন্ত বলি, কোষ হিসেবে দেখতে গেলে এর অনেকটা non-living।’

- ‘যাহ’ – এবার একটু হতাশ দেখাল তোতনকে।

রঞ্জুদা মিটিমিটি হেসে বলল, ‘catch miss, আমি কিন্তু বললাম কোষ হিসেবে দেখতে গেলে ...’

‘ওওও, মানে ওই’ তোতন বলে।

প্রায় ছোঁ মেরে বলে ওঠে রঞ্জুদা, ‘যেমন ওই বাড়ীর ইটের মত, বা জাপানের মন্দিরের কাঠের মত ...’

তোতন বলে, ‘মানে ওই আমাদের শরীরের কোষের মত। কিন্তু রঞ্জুদা, আগের কথা অনুযায়ী একজন জীবিত সেটা ওই একেকটা কোষের জন্য নয়, বরং পুরোটা মিলে জীবিত’।

- ‘ঠিক। কোষ হিসেবে বলতে গেলে সঠিককরে বলা যাবে না জীবিত ব্যাপারটা, কারণ অনেক কোষই থাকতে পারে যেগুলোকে ঠিক জীবিত বলা যায়না’

- ‘আবার সবকটা কোষ বদলে গেলেও আমি আমিই থাকব, কারণ আমি কোষ দিয়ে তৈরি হলেও প্রতিটা কোষই আলাদা করে আমি নয়।’

এবার রঞ্জুদাকে একটু ভাবুক দেখালো, ‘দেখ আমার দৌড় এই অব্দি। কারণ এর পরেরটুকু বুঝতে গেলে জানতে হবে, একজন মানুষের জীবন কোথায় থাকে, এটুকু বোঝা যাচ্ছেযে, সবকটা কোষ জুরে দিলে সেটা অনেকগুলো কোষের একটা মন্ড হতে পারে, কিন্তু জীবিত হতে গেলে সবকটা কোষকে একসাথে নতুন কিছু করতে হবে। এই জায়গাটা মনে হয় না জানা গেছে।’

‘যাক। রঞ্জুদাও কিছু কিছু জিনিস জানেনা।’ ভাবল তোতন। মনে মনে একজন সুপারহিরোকে আটকে দেওয়ায় নিজেকে জয়ী লাগছে এখন। তবে একটু খচখচ রয়েই গেল।

****

বৃষ্টিটা থেমেছে, রাস্তাটা পার হয়ে লেকের মাঠের দিকে হাঁটা লাগাল তোতন। বিল্লুই আসছে উল্টোদিক থেকে।

‘কি রে, চল তোদের বাড়ী। computer এর কি হল?’ তোতন জিজ্ঞাসা করল।

হাড়ির মত মুখ করে বিল্লু বলল - ‘ধ্যার। মামার computer, পুরোনো, চলছেই না। বলেছিল একটু সারিয়ে চালাতে, লোক এসে বলল যা change করতে হবে, তাতে সবই প্রায় নতুন হয়ে যাবে। বাবা বলেছে এর থেকে নতুন কিনে নেওয়াই ঠিক।’

‘হ্যাঃ। তাই কর। সব change করে সারালেও ওটা তোর না, মামার computer ই হয়ে থাকবে’। বিজ্ঞের হাসি হাসল তোতন। বদলের মধ্যেও রহস্যটা বেশ লাগছে।

শাশ্বত রায়

বাক্স বদল

পার্থ প্রতিম ব্যানার্জী

<১>

কোন দিন যে কার কপালে কি লেখা আছে তা কেউ জানে না! মূল গল্পতে যাবার আগে আমি একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তবে কোনোটাই গল্প কথা নয় আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কাহিনী। ২০১৯ সালে একবার ধানবাদ থেকে কলকাতায় নিজের বাড়ি ফেরার সময় পুরো রাত ট্রেনে ভ্রমণ করে, সকালে হাওড়া স্টেশনে নেমে, প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছে, সেখান থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে, চান করে, অফিসের কিছু আর্জেন্ট কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখলাম ল্যাপটপ ব্যাগটাই নেই ! আস্ত একটা ল্যাপটপ ব্যাগ কোথায় গেলো ! সপরিবারে বেশ কয়েকটা বাক্স আর ছোট বড়ো ব্যাগ নিয়ে বেশ কয়েক দিন পর বাড়ি ফিরেছি। সব ব্যাগ ঠিক আছে, শুধু আমার ল্যাপটপ ব্যাগটাই নেই। এঘর ওঘর খুঁজে কোথাও পেলাম না। ভাবতে লাগলাম ! ওটা তো কখনো আমি হাত ছাড়া করি না ! যাইহোক এবারে সারা রাত ট্রেনের স্লিপার কোচে ভ্রমণ করার সময়ও তার অন্যথা হয়নি।

তবে এবার যে ব্যাগটা বাড়ি নিয়ে ঢুকিনি সেটা কিছুক্ষনের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে গেলো। তাহলে কি ট্যাক্সিতে ফেলে এলাম ! যদি ট্যাক্সিতে ফেলে আসি তাহলে তো পেয়ে যাবারই কথা। কারণ ওটা তো ছিলো প্রিপেইড ট্যাক্সি। না, সম্ভবতঃ ওটা ট্যাক্সিতে রাখিনি, ট্রেনেই ফেলে এসেছি। তখন বাচ্ছা ছোট থাকায় ট্রেন থেকে নামার পর শিবানী বাচ্ছাদের সামলাতো আর আমি মালপত্র সমলাতাম। আমার পিঠে থাকতো ল্যাপটপ ব্যাগ আর হাতে থাকতো বড়ো লাগেজ। আমরা সবাই হেঁটে প্লাটফর্ম ধরে এগিয়ে যেতাম প্রিপেইড ট্যাক্সি বুথের দিকে। কিন্তু এদিন সব কিছু নিয়েছিলাম, কিন্তু পিঠে ব্যাগটা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর এটাতেই হলাম বিভ্রান্তির শিকার! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল! বাপী বললেন, সংকটের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়! তাই আমি যেনো একটা অজানা শক্তির সহায়তায় প্রয়োজনীয় সব নিয়মকানুন যাতে ঠিক ঠিক পালন করা হয়, সেই দিকেই মনোনিবেশ করে, প্রথমেই গোটা তিনেক ব্যাংকে গিয়ে ATM কার্ড আর চেকবুক গুলোকে অকেজো করলাম। তারপর পর্ণশ্রী থানায় গিয়ে ডায়েরী লেখানোর চেষ্টা করলাম। পুলিশ কর্তাদের প্রথম প্রশ্নটাই ছিল মিসিং ডায়েরীটা যে করতে চলেছি, তো মিসিংটা হয়েছে কোথায়!? আমি বললাম যে সেটা তো ঠিক মনে পড়ছে না । ব্যাগটা হয় ট্যাক্সীতে ছেড়ে এসেছি, নাহলে ট্রেনে ফেলে এসেছি !! পুলিশরা আমাকে বললেন, এটা ওনাদের কেস নয়, হাওড়া স্টেশনে গিয়ে GRP র কাছে ডায়েরী করতে। অগত্যা পর্ণশ্রী থেকে বাস ধরে সোজা হাওড়া স্টেশন !

হাওড়া স্টেশনে মূলতঃ দুটো কাজ সারলাম । একটা হলো হাওড়া পুলিশে প্রিপেইড ট্যাক্সি বিল দেখিয়ে একটা কমপ্লেন লজ করা, আর অন্যটা হলো GRP তে মিসিং ডায়েরী করা। এখন যেসমস্ত জিনিস আমার ব্যাগে ছিলো সেগুলো ফিরে পাবার থেকেও ডুপ্লিকেট বানানোর পদ্ধতিটা বেশি জরুরী এবং তার জন্য চাই একটা FIR । আমার জিনিস ফিরে পেলে ভালো, না পেলেও যাতে অন্তত সব হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলো আবার ডকুমেন্টাইজ করে ফেলতে পারি সেটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে GRP র পুলিশ কর্তা রাজি হলেন এবং আমাকে সাদা কাগজে দরখাস্ত লিখতে বললেন। আমি তাই করলাম। সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোর তালিকা অ্যাটাচ করে দিলাম। রিসিভ করে নিয়ে রিসিভিং স্ট্যাম্প মেরে এক কপি আমাকে ফেরৎ দিলেন। আমি সেটাকেই আমার সম্পদ হিসেবে আমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম ।

সন্ধ্যের দিকে আমার এক অফিসের সহকর্মীর ফোন এলো। উনি আমাকে জানতে চাইলেন , আমার কি কিছু জিনিস হারিয়েছে ! মনে হয় তার কিছুটা উদ্ধার হয়েছে। আমি যেনো ধানবাদের " অস্মিতা স্টুডিও" নামক একটি স্টুডিওর সাথে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করি। আমি কোনোকিছুর সাথেই যেনো কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না ! তবুও " অস্মিতা স্টুডিও" র সাথে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করলাম। এই স্টুডিওতে আমার বহুল যাতায়াত আর দীর্ঘদিনের পরিচয়। কিন্তু আমার ব্যাগ হারানোর সাথে এই স্টুডিওর কি সম্পর্ক সেটা কিছুতেই আঁচ করতে পারলাম না! যাইহোক স্টুডিওতে ফোন করার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি ফোন ধরলেন এবং আমাকে একটা কন্টাক্ট নম্বর দিয়ে হাওড়া জিআরপি থানায় কোনো এক ব্যক্তির সাথে দেখা করতে বললেন। তখন রাত প্রায় সোয়া নটা। আমি তৎক্ষণাৎ ফোন করলাম উনি জানালেন আমার একটা ডকুমেন্ট ফোল্ডার উদ্ধার হয়েছে। পরের দিন ওনার মর্নিং শিফট ডিউটি থাকবে, ১২ টার মধ্যে এলেই চলবে।

পরিবারের বাকি সকলকে কোলকাতায় রেখে পরের দিনই আমার হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে ধানবাদ ফেরার পালা। তাই সকালেই রওনা দিলাম। নিউ কমপ্লেক্সের একটা প্লাটফর্মে জিআরপি পুলিশের একটা বুথে গিয়ে খোঁজ করতেই উক্ত ভদ্রলোককে পেয়ে গেলাম। উনি রেলের জিআরপি দপ্তরে চাকরী করেন। গতকাল রেল লাইনে টহল দেবার সময় রেক্সিনের এই ডকুমেন্ট ফোল্ডারটা কুড়িয়ে পেয়েছেন। তুলে এনে ওনার বসকে দেখাতে ওনার বস বলেন , "এটাতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটা ডকুমেন্ট ফোল্ডার। এক্ষুনি যোগাযোগ করে এটা ফেরৎ দাও।" এরকম নির্দেশ পেয়ে ব্যক্তিটি সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠিকানা বা ফোন নম্বর খোঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু সব ডকুমেন্টস হাতড়ে দেখেন কিছু পাসপোর্ট সাইজের ফটোর প্যাকেটের ওপর স্টুডিওর নাম ও কন্টাক্ট নম্বর লেখা। "অস্মিতা স্টুডিও" ফোন তুলে বুঝতে পারে আমারই জিনিস খোয়া গেছে, আমার কন্টাক্ট নম্বরটা ওনার কাছে না থাকায় আমার এক অফিস সহকর্মী মিস্টার রাকেশ ভাদোরিয়াকে ফোন করেন এবং আমার অফিস কলিগ আমাকে ফোন করেন। এবার পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে পরিস্কার হলো। আমি জিআরপি পুলিশ কর্মীটির কাছ থেকে ফোল্ডারটি নিলাম, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম।

<২>

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে! বাচ্চারাও এখন অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে। ওরাও এখন আমাদের সাথে সাথে মালপত্র নজর রাখতে শিখে গেছে। এখন আমরা সব সময় ট্রাভেল শুরু ও শেষ করার মুহূর্ত গুলোতে খুব সতর্ক থাকি এবং বার বার মোট লাগেজের সংখ্যা মিলিয়ে নিতে থাকি।

এবার বেশি দিন হাতে নিয়ে কোলকাতায় আসিনি। এবার কোলকাতায় আসার মূল লক্ষ্য ছিল পুরনো বন্ধুদের সাথে ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২২ পিকনিকে যোগদান করা। ২ তারিখের ধানবাদ প্রত্যাবর্তনের দিনটাও ছিল পূর্বনির্ধারিত এবং সেই অনুসারে ট্রেনের টিকিটও কাটা ছিল। ট্রেন বলতে বিকেল ৫:২০র ট্রেন হওয়ায় তেমন তাড়াহুড়ো ছিল না। ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস। আমরা C১ কম্পার্টমেন্টের ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নম্বর সিটগুলিতে বসলাম। আমাদের সাথে ছোট বড়ো মিলিয়ে মোট ১০ টা লাগেজ ছিল। তার মধ্যে দুটো চাকা লাগানো লাগেজ। একটা নীল রঙের চাকা লাগানো ব্যাগ আর একটা ধূসর রঙের চাকা লাগানো সুটকেস। যথারীতি দুটি লাগেজ শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনা যেদিকে বসেছিল সেদিকের তাকে পাশাপাশি রাখলাম। আমি সীট পেয়েছিলাম ওই সীটেরই সোজাসুজি একই সারিতে দুই সীটওয়ালা জায়গায়। আমার দিকের তাকে রাখলাম ফুলঝুরির স্কুল ব্যাগ, আমার ল্যাপটপ ব্যাগ আর কিছু খাবার দাবারের হ্যান্ড ব্যাগ। ট্রেন নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে এগিয়ে চললো। কিছু সীট খালি রয়েছে, মাঝে মাঝে ভর্তি হতে থাকলো। আবার কিছু যাত্রীরা মধ্যবর্তী স্টেশনে নেমে যেতে লাগলেন।

ট্রেন ধীরে ধীরে ধানবাদ স্টেশনে নির্ধারিত সময়েই ট্রেন ঢুকিয়ে দিলো। একবার rack গুলোতে আর সীটের ওপর রাখা ব্যাগগুলোতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম সব ঠিক আছে। মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম ট্রেন দাঁড়ালেই সমস্ত মালপত্র নিয়ে দ্রুত স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবো। ট্রেন দাঁড়ালো। লোকজন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নামতে শুরু করলেন। আমরা সাধারণত এখন ধীরে সুস্থে, চারিদিকে দেখে নিয়ে, মালপত্র ভালোভাবে গুনে নিয়ে, তবেই দরজার দিকে পা বাড়াই। C১ compartment এ লোকজন যখন একদমই কমে গেছে , তখন rack এর লাগেজ গুলো নামতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের ধূসর রঙের চাকা লাগানো বাক্সটা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও দেখলাম সব Rack ফাঁকা হয়ে গেছে। সামনে পিছনে বেশ কয়েকটা সীটে চোখ বুলিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু নেই।

হঠাৎ চোখে পড়লো C২৫, ২৬, ২৭ সীটের ঠিক পেছনের সারিতে অর্থাৎ C২০, ২১, ২২ সীটের ঠিক নীচের দিকে, একটা ধূসর রঙের বাক্স উঁকি মারছে। আনন্দে বুকটা যেনো লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু ভাবতে লাগলাম বাক্সটাতো ওপরে রেখেছিলাম, কিন্তু কে নীচে নামালো! আমাদের বাক্স আমি ছাড়া তো কেউ নামায় না! নাকি অন্য কেউ নামিয়ে নীচে রেখেছে ! বাক্সটাকে টেনে বের করলাম। কিন্তু বের করার পর বুঝলাম এটা আমাদের বাক্স নয়। হুবহু একই রঙের, আর একই আকৃতির চাকা লাগানো বাক্স, শুধু সাইজে একটু ছোট। এরও হ্যান্ডেলে আমাদের বাক্সটার মতো হুবহু একটা সাদা সুতো ঝুলছে ! এটা সম্ভবতঃ air বা Volvo যাত্রাতে লাগেজ রাখার সময় লাগিয়ে দিয়েছিলো ! কাগজের ট্যাগটা ছিঁড়ে গেলেও সুতোটা রয়ে গেছে। হাতে নিয়ে বুঝলাম, ওটা ওজনে আমাদের বাক্স থেকে বেশ কিছুটা কম।

আমাদের মাথায় তখন একটাই অনুসিদ্ধান্ত এলো যে বাক্সটা বদল হয়ে গেছে ! যে বা যিনি এটা নিয়েছেন তিনি ভুল করেই নিয়েছেন, ইচ্ছাকৃত নয় বা চুরি করারও কোনো উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি ওনার নেই! তাই শিবানীকে বললাম, "দ্রুত চলো, হয়তো লোকটাকে পেয়ে যেতে পারি !" আমরা আমাদের বাকি জিনিসপত্রের সাথে অজানা বাক্সটিকেও সঙ্গে করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। এদিক ওদিক, সামনে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম করো কাছে ওরম কোনো বাক্স দেখা যায় কিনা ! কিন্তু না, সেরকম কিছু চোখে পড়লো না ! ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে বেরনোর সময় লক্ষ্য রাখলাম, আমাদের বাক্সটি কাউকে carry করতে দেখা যায় কিনা ! ১নম্বর প্ল্যাটফর্মের একটা Amul Cool এর স্টলের সামনে শিবানী, ফুলঝুরি আর সাইনাকে দাঁড় করিয়ে আমি খুব দ্রুত ধানবাদ রেলস্টেশনের মূল ফটকের দিকে এগিয়ে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে অটো স্ট্যান্ড অবধি পৌঁছে গেলাম ! কিন্তু কারোর হাতেই এমন বাক্স দেখা গেলো না।

এবার এক উর্দ্ধিধারী সরকারী কর্মচারী উপদেশ দিলেন GRP অফিসে যাবার জন্য। রাত প্রায় পৌনে ১১টা বাজে ! পুলিশ কর্মীদের নাইট শিফট ডিউটি চলছে। আমি সোজা ওনাদের ঘরে ঢুকে গেলাম এবং সমস্ত কিছু সবিস্তারে বিবৃত করলাম । এও জানালাম প্রায় একই রকম দেখতে যে বাক্সটি আমরা পেয়েছি সেটা আমাদের কাছেই আছে এবং সেটা আমরা খুলেও দেখিনি। এটা শুনে ওনারা বললেন, ওই বাক্সটি ওনাদের কাছে নিয়ে আসতে। আমি বললাম, "আমি এক্ষুণি বাক্সটা নিয়ে আর সবাইকে নিয়ে আসছি।" এই বলে আমি বেরিয়ে গেলাম। ওরা তখনও ওখানেই দাঁড়িয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সবাই মিলে হেঁটে ও চাকা লাগানো বাক্সটাকে গড়িয়ে নিয়ে GRP পুলিশ স্টেশনে পৌঁছলাম। আমরা প্রথমেই আমাদের খুঁজে পাওয়া বাক্সটি পুলিশ কর্মীদের হাতে তুলে দিলাম। ওনারা বাক্সটা খুললেন। সৌভাগ্যবশতঃ বাক্সটা লক করা ছিল না ! আমাদের যেটা হারিয়েছে সেটারও অবশ্য তাই। বাক্সটি খুলে যে সমস্ত সামগ্রী পাওয়া গেলো সেটা দেখে বোঝা গেলো ব্যক্তিটি সম্ভবতঃ কোম্পানী সংক্রান্ত আইন আদালতের সাথে যুক্ত। পুলিশ কার্মীরা বাক্স হাতড়ে বললেন ওনার কোন নাম ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই উনি যদি নিজে এসে যোগাযোগ না করেন তাহলে কিছু করা যাবে না। আমি জানতে চাইলাম, একটা ডায়েরী করার প্রয়োজন আছে কিনা ! ওনারা বললেন, "এক্ষুণি ডায়েরী করার কোনো প্রয়োজন নেই।" ওনারা আমার কন্টাক্ট নম্বর রেখে দিলেন এবং পরের দিন খোঁজ নিতে বললেন। তাই আমরা আমাদের নিজেদের বাক্স খুইয়ে আর খুঁজে পাওয়া বাক্স পুলিশ হেফাজতে দিয়ে একটা অটো রিজার্ভ করে ধানবাদ সিটি সেন্টার বাসস্থানে ফিরে এলাম।

বাড়ী ফিরে অন্যান্য বারের মতো কোলকাতার বাড়িতে ফোন করে জানাতেই বাপী আমাদের দেরীর কারন জানতে চাইলেন। বাপীকে সমস্ত ঘটনা অনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। বাপী বললেন সুদীপদাকে ফোন করতে। সুদীপদা হলো আমাদের কোলকাতায় বেহালা বাড়ির প্রতিবেশী এবং ভারতীয় রেলের একজন অভিজ্ঞ কর্মী। তখন রাত ১২ টা অতিক্রান্ত। মনের মধ্যে বিশেষ দ্বিধা না রেখেই ফোন করে ফেললাম। সৌভাগ্যবশতঃ সুদীপদা তখন ইভিনিং শিফট ডিউটি করে বাড়ি ফিরছিলেন। আমার সমস্ত কথা শুনে আমাকে উপদেশ দিলেন ১৩৯ নম্বরে রেলের হেল্পলাইনে ফোন করতে। আমি ফোন করলাম। Whole Night সার্ভিস ! কমপ্লেন লজ করলাম। রাত ২টো নাগাদ ও ভোর ৫টা নাগাদ রেল পুলিশের পক্ষ থেকে দুবার ফোন এলো। আমি দুবারই অনুপূর্বিক বর্ণনা দিলাম। রাত্রে ঘুম ঠিকমতো হলনা!

<৩>

৩ রা জানুয়ারী, ২০২৩, মঙ্গলবার ! অর্থাৎ ঘটনার পরের দিন ! গত রাত্রে ঝাড়খণ্ড GRP বলেছিল দিনের শেষে খোঁজ নিতে। সারাদিনে যদি কোনো ব্যক্তি ওনার বাক্সটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসেন, তবে দিনের শেষেই ওনারা আমাকে উপযুক্ত কিছু তথ্য পরিবেশন করতে পারবেন। কিন্তু আমার যেনো আর তর সইছিল না। এর একটা সুষ্ঠ মীমাংসা আমার এক্ষুণি চাই। তাই শিবানীকে বললাম, দেরী করে লাভ নেই। অফিস না গিয়ে ধানবাদ স্টেশনে যেতে হবে। তাই সকাল ৭টার মধ্যে একটা অটোরিকশা করে আমরা ধানবাদ স্টেশনে পৌঁছে গেলাম।

গত রাত্রে সুদীপদা বলেছিলেন GRP আর RPF এ আলাদা করে ডায়েরী করে দিতে। তাই আমরা প্রথমেই GRP র অফিসে গিয়ে বললাম , "আপনারা enquiry চালিয়ে যান, আমি একটা ডায়েরী করে যেতে চাই। শুধু আপনাদের এখানে নয়, ডায়েরী করতে চাই RPF এও।" ওনারা প্রথম প্রথম ডায়েরী করার ব্যাপারে তেমন encourage করতে চাইছিলেন না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা দেখে ওনারা বললেন বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলছে, ভোর রাতে একজন ট্রেনে কাটা পড়েছে, তাই সবাই ব্যস্ত আছে ও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। আমি বললাম, "আমি অপেক্ষা করতে রাজী আছি, আমার হাতে সময় আছে।"

দেখলাম বিদ্যুৎ বিপর্যয় দীর্ঘ সময় ধরে চলছে। তাই আমরা আরপিএফ অফিসে গিয়ে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে একটা ডায়েরী নেবার জন্য আবেদন জানালাম। ওনারা বললেন, জিআরপি অফিসে ডায়েরী করে তার একটা কপি আরপিএফ অফিসে দিয়ে দিলেই চলবে। অগত্যা তখন আমরা আবার জিআরপি অফিসে গিয়ে দেখলাম পাওয়ার তখনও আসেনি। আমরা অফিসের বাইরে এসে প্রখর সূর্যালোকে কালকের বাক্সটিকে আরো একবার ভালো করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আবেদন জানালাম। উনি আমাদের কথা রাখলেন। আবার বাক্স খোলা হলো।

গত রাত্রে যে চিরকুট জাতীয় একটা কাগজ পাওয়া গেছিলো এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার যেটা থেকে তেমন মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছিলেন, সেটা আজ আমি প্রখর সূর্যালোকে আরো একবার ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম এবং বুঝলাম সেটা আর কিছুই নয়, একটা হোটেলের বিল। বুঝলাম ব্যক্তিটি কোলকাতার পার্ক স্ট্রীট এলাকার কোনো হোটেল বা রেষ্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করে এই বিলটি পেয়েছেন। এই বিলটিতে খাবারের মেনু ও মূল্য ছাড়াও ছিলো ফোন নাম্বার।

ইউরেকা !!!!

এটাতেই বুঝলাম অনেক ধোঁয়াশা কেটে যাবে ! শিবানীকে ওর মোবাইলে নাম্বারটা নোট করিয়ে উক্ত ব্যক্তিটিকে ফোন করতে বললাম। শিবানী ফোন করলো। ওপর প্রান্তে কেউ ফোন ধরলেন। শিবানী কিছু বোঝাতে চাইলো। কিন্তু ব্যক্তিটি বিশেষ কথা না বলেই কেটে দিলেন। অর্থাৎ যে আশার আলো জাগরিত হয়েছিল সেটা নিষ্প্রভই রয়ে গেল। একরাশ হতাশা বহন করে আমরা যে পথে হাঁটছিলাম আবার সে পথেই হাঁটতে শুরু করলাম। অর্থাৎ একটা ডায়েরী করার জন্য প্রস্তুত হলাম। ইতিমধ্যে পাওয়ারও এসে গেছে। আমি একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে দ্রুত গতিতে খস খস করে এক পাতা application বানিয়ে ফেললাম। xerox এর দোকানের খোঁজে পৌঁছে গেলাম জনবহুল ধানবাদ স্টেশনের মূল ফটকের দোরগোড়ায়।

হঠাৎ শিবানীর ফোনটা বেজে উঠলো। একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলো। ওপর প্রান্তের ব্যক্তিটি জানতে চাইলেন, উনি এই কলটি পেয়েছেন। কথাগুলো শুনে বুঝলাম রেস্টুরেন্ট বিল থেকে আবিষ্কৃত হওয়া যে নাম্বারে শিবানী সকালে ফোন করেছিল, তিনি সে সময় ঘুমের ঘোরে ছিলেন। পরে বুঝতে পেরে নিজেই কল করেছেন। আবার যেনো হাতে স্বর্গ ফিরে এলো ! অপর প্রান্তের ব্যক্তিটি বললেন, ওনার কাছেই আমাদের বাক্সটি এসে গেছে। গতরাত্রে এটা উনি অনুধাবন করতে পারেননি। তাই ওই ভাবেই বাক্সটিকে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ওনার মা সন্দেহ করেছিলেন বাক্সটি ওনার নয়, কারণ ওনার বাক্সটি সাইজে অতো বড়ো আর এতটা ভারী নয়। কিন্তু ঘুমের ঘোরে উনি ওনার মার কথায় তেমন আমল দেননি। কিন্তু এখন ফোন পাবার পর উনি পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা ওনার বাক্সটা নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় জিআরপি অফিসে জমা দিয়েছি শুনে খুব খুশি হলেন। উনি বললেন গত রাত্রে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৫/৬ দিয়ে উনি বেরিয়ে গেছেন। শিবানী বললো, আমাদের বাক্সটা নিয়ে ধানবাদ জিআরপি অফিসে চলে আসতে। আমরা ওখানেই থাকবো।

Xerox এর দোকান থেকে জিআরপি অফিসে পৌঁছানোর কিছুক্ষনের মধ্যেই একজন ব্যক্তি একটি সুটকেস নিয়ে জিআরপি অফিসে হাজির হলেন। দেখে নিশ্চিৎ হলাম যে এটা আমাদেরই সুটকেস। আমাদের দেখে নিতে বললেন। দেখলাম সব ঠিক আছে। এদিকে আমরা ওনার বাক্স টাকেও খুলে দেখে নিতে বললাম। উনি দেখে বললেন সব ঠিক আছে। জিআরপি পুলিশ অফিসারদের মধ্যে একজন তখনও নাইট শিফট থেকেই আছেন। উনি বললেন, "বলেছিলাম না যে ডায়েরী করার কোনো দরকার নেই !? "

সত্যি কথা বলতে কি , যতক্ষণ না হারানো সামগ্রী হাতে আসে ততক্ষণ মন বিচলিত থাকে এবং process এ চলতে ইচ্ছা করে। মনে হয় যে process এর বাইরে গেলেই যেনো সব কিছু হাত থেকে বেরিয়ে যাবে এবং জবাবদিহি করতে হবে। বিশেষতঃ যখনই ল্যাপটপ ব্যাগ হারানোর স্মৃতি উদ্ভাসিত হয়, তখনই একটা অসহায়তা যেনো মনের ভেতর দুর্বার গতিতে ঘুরপাক খেতে থাকে। তখন যেনো মনের অসহায়তা যুক্তি, তর্ক, আইন, আদালত, নিয়ম, কানুন সব কিছুর উর্ধ্বে চলে যায়। সবই এসে ঠেকে কর্ম আর পরিণতিতে। সবই মায়াজালে আবদ্ধ মানুষের দৌরাত্ম্য আর চক্রধারীর কর্মকুশলতা বলে প্রতিপন্ন হয়!

যাইহোক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির বাক্সটা ওনার হাতে তুলে দিলাম ও আমাদের বাক্সটা ফিরে পেলাম। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম! হয়রানি হতে হলো বটে , কিন্তু গতবারের মতন তিক্ত অভিজ্ঞতা এবার হলনা। অন্ততঃ এবার হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী সম্পূর্ণ ও অক্ষত অবস্থায় ফিরে পেয়ে, বাড়ি নিয়ে যেতে পারলাম। বুড়ীমা তথা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর প্রতি জানালাম আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! ফেরার পর ফুলঝুরি আর সাইনা ওটা দেখে খুব আনন্দ পেলো। ওরা বাক্সটা খুলে ওদের জিনিসপত্র গুলো যেনো বুঝে নিতে চাইলো ! বেহালার বাড়ীতে ফোন করে মা বাপিকে শুভ সংবাদটা জানাতে ওনারা খুবই আশ্বস্ত হলেন ! বললেন, "আমরাও খুব চিন্তা করছিলাম!" সুদীপদাকে জানালাম ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রতিটা শুভ সমাপনের জন্য থাকে বেশ কিছু মানুষরূপী ভগবানের অবদান, যাদের মাধ্যমে ভগবান ঘটান তাঁর নির্ধারিত কার্যকলাপ, ঘটে অবাঞ্ছিত পরিণাম এবং অনুভূত হয় অদৃশ্য শক্তির প্রভাব ! ঘটলো 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'। যার অর্থ কোনো কিছুর সমাপ্তি সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের "বাক্স রহস্য" গল্প ও সিনেমা অনেকেই পড়েছি বা দেখেছি, কিন্তু বাস্তবে যে এটা ঘটা সম্ভব সেটা কখনোই ভাবিনি ! এটা আমার জীবনের একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং চিরদিন মনে থাকবে ! তাই আমি আমার প্রিয় পাঠকবর্গের কাছে আমার এই অভিজ্ঞতা তুলে ধরলাম !

শাশ্বত রায়

মা দুর্গা ও নব রাত্রির আধ্যাত্মিক রহস্য এবং আমাদের মধ্যে দিব্যতার উন্মোচন

পিন্টু বাগ

দুর্গা মা, কালী মা, পার্বতী মা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, চার দিকে দেবীদের আহ্বান, জাগরণ, ব্রত, পবিত্র জীবন পালন করতে দেখা যাবে পুজো পর্ব শুরু হলেই। চারি দিকে মহল হবে স্বাত্ত্বিকতার। কত ভালোবাসার সাথে, ভাবনার সাথে, শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হবে এই দিনগুলি। শক্তির আহ্বান করা হবে, শিব শক্তির আহ্বান করা হবে। কিছু ক্ষন, এর উপর চিন্তন করা যাক। আমরা দূর্গা মাকে শক্তিও বলি, মাও বলি। দেবীকে আমরা অস্ত্র শস্ত্রর সাথে দেখাই। দূর্গা মায়ের চরণে আমরা অসুর কেও দেখাই। এ সব জিনিস প্রকৃত পক্ষে কি দর্শায় ? দেবীর চিত্র, আর চরণে অসুর ? দেবীরা কি হিংসা করতেন ? অসুরদের উপর দেবীরা হিংসা করেছিলেন ? এর পিছনে কি কোনোও অন্তর্নিহিত অর্থ আছে ? যে শক্তির আহ্বান করা হচ্ছে তা কোন শক্তি ? কোথা থেকে ওই শক্তিদের আহ্বান/ডাকা হচ্ছে ? একটু ভাবা যাক। দিব্যতা, পবিত্রতা, এ সব আত্মার original গুন্। যা আজ আমরা ভুলে গেছি। কারণ দিব্যতা কে ভুলে গেলে, আমাদের ভিতরের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার আবির্ভূত (emerge) হয়ে যায়। দিব্যতা merge হয়ে যায়, আর বিকারগুলো emerge হয়ে যায়। ধরা যাক এটাকে symbolically বা ছবির (pictorially) সাহায্যে দেখাতে হবে, অর্থাৎ, দিব্যতা বিকারের বা অপবিত্রতার উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছে, পবিত্রতা ego র উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছে। তাহলে, বিকারদের কেমন করে দেখাবো ? যেমন কোথাও দেখানো হয় যে smoking is not allowed | কোথাও দেখানো হয় danger | আমরা কি করি ? Skull এঁকে দেখাই, cross লাগাই। অসুরকে দূর্গা মায়ের পায়ের নিচে দেখানো হয়, সে প্রকৃত পক্ষে অসুর নয়, আমাদের ভিতরের আসুরি বৃত্তি বা negativity, আমাদের ভিতরের খারাপ স্বভাব, আমাদের ভিতরের weaknesses, আমাদের ভিতরের বিকার/jealousy/দ্বেষ/ঘৃণা/আঘাত/rejection/manipulation /control /domination...লম্বা লিস্ট। কারণ আমরা খেয়াল রাখিনি তাই আমরা আমাদের ভিতরের অসুরদের জাগ্রত করে রেখেছিলাম। আমাদের নিজেদের ভিতরের দিব্যতা কে আহ্বান (invoke) করতে হবে। কারণ, যেমন যেমন দিব্যতা invoke হতে যাবে, দিব্যতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে emerge হবে ও বিকারগুলো merge হয়ে যাবে। Vices emerge হলে দিব্যতা (divinity) automatically merge হয়ে যায়। কারণ, যেকোনোও এক মুহূর্তে যে কোনো একটাই গুন্ emerge হয়ে থাকতে পারে। দেবীদের আহ্বান করা মানে invoking দিব্যতা। দেবীদের উপর (আকাশ) থেকে আহ্বান করতে হবে না, নিজের নিজের ভিতর থেকে দিব্যতা কে জাগাতে/উন্মোচন করতে হবে। কারণ, প্রত্যেক আত্মার ভিতরে দিব্যতাও আছে, দুর্বলতাও আছে | যে দিব্যতা কে আজ আমরা স্মরণ করছি ও আহ্বান করছি, তাও আমাদের ভিতরেই আছে। যে অসুরকে দেবীর পায়ের নিচে দেখানো হয় তাও আমাদের ভিতরেই আছে। দেবীরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, মর্যাদাপুরুষোত্তম এবং অহিংসা দেবীবের পরম ধর্ম। যার ধর্ম অহিংসা, তিনি হিংসা করছেন, এমনটা কিভাবে হতে পারে ? দেবীরা কি দশটা হাতের (দশ ভুজা) সাথে জন্ম নিয়েছিলেন ? আজকে যদি আমাদের বাড়িতে একটা বাচ্চা দশটা হাতের সাথে জন্ম নেয়, সাথে সাথে আমরা কি করবো ? ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করে দেওয়া হয় | এটা আটটা অতিরিক্ত হাতের ব্যাপার নয়, এটা হলো, আমাদের মধ্যেকার অষ্ট শক্তির কথা। অর্থাৎ, আত্মার আট শক্তির কথা বলা হচ্ছে। ভুজা/হাত হলো শক্তির প্রতীক। প্রত্যেকটা হাতে এক একটা অস্ত্র/শাস্ত্র দেওয়া। অস্ত্র/শাস্ত্র শক্তি/জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের শাস্ত্র নিয়ে আত্মা নিজের ভেতরের শক্তি কে জীবনে ব্যবহার করলে দিব্যতা কে emerge করা যাবে। যখন দিব্যতা emerge হয়ে যাবে, তখন বিকারগুলো merge হয়ে যাবে। দশ ভূজাধারী, মানে অতিরিক্ত অষ্ট ভূজাধারী অর্থাৎ, অষ্ট শক্তিধারী দিব্য আত্মা। অষ্ট শক্তিগুলি হলো - সহন করার শক্তি, সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, বিচার শক্তি, নির্ণয়ের শক্তি, সহযোগ শক্তি, অন্তর্লীন করার শক্তি, সংকোচন শক্তি ও প্রত্যাহার শক্তি। অথচ, খুব সহজে আমরা বলে দেই যে আমার মধ্যে তো কোনো শক্তিই নেই, আমার দ্বারা সহন হয় না, আমি কারুর সাথে adjust করতে পারবো না, adjust করবো তো কত adjust করবো, আমিই শুধু সবার টা adjust করবো না কি, এমন সব কথা বলতে বলতে আমরা আমাদের ভিতরের শক্তিগুলোকে কমিয়ে দিচ্ছি দিন প্রতিদিন। এই পুজোর মাসে আমরা এই অষ্ট শক্তিগুলো কে আহ্বান করবো। আহ্বান করার জন্য আমরা জাগরণ করি। অজ্ঞানের নিদ্রা থেকে জাগরণ, কলিযুগের অন্ধকার থেকে প্রকাশে যাওয়ার জন্য awakening র প্রয়োজন। Awakening, অর্থ্যাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জাগা। আবার নব রাত্রির নয় দিন আমরা ব্রতও রাখি। ব্রত পালনকে একটু গভীর ভাবে দেখা যাক। শুধু কি খাওয়া দাওয়ারই ব্রত রাখবো ? ব্রত মানে pledge নেওয়া - 'আত্মাকে এই এই গুলো করতে হবে'| খাওয়া দাওয়ার ব্রতর সাথে সাথে আমরা ব্রত নেই যে আমরা এই নয় দিন রাগ করবো না - শান্ত থাকবো, পরচিন্তন করবো না, কারুর ব্যাপারে খারাপ কোনো কথা এখানে ওখানে ছড়াবো না, নয় দিন সকালে তাড়াতাড়ি উঠে ধ্যান (Meditation) করবো, কোনো খারাপ জিনিস খাবো না ও পান করবো না। ব্রত তো অনেক কিছুরই করা যায়। ব্রত নিলে আত্মার শক্তি বাড়ে। এক নিয়মানুবর্তীত জীবন জাপন শুরু করি। পূজাতে সমস্ত ভোগও বানানো হয় স্বাত্ত্বিক ধারায় অর্থাৎ, বিনা পেঁয়াজ /রসুন ব্যবহার করে পরমাত্মার স্মরণে বানানো | দিব্যতা ও স্বাত্ত্বিকতা সব সময় একসাথে চলে। অর্থাৎ তামসিক খাওয়ার খেলে দিব্যতা emerge হবে না। স্বাত্ত্বিকতার আর একটা দিক হলো সঠিক উপায়ে উপার্জিত ধনে অন্য বানানো। সঠিক উপায়ে উপার্জিত ধন, বিনা পেঁয়াজ/রসুন ব্যবহার করে পরমাত্মার স্মরণে বানানো নিরামিষ অন্যই প্রসাদ হয়। পুজো পার্বন আসে আমাদের জীবন জাপন করার পদ্ধতি শেখাতে। তাহলে শুধু এই নয় দিন কেন ? পবিত্র জীবন শুধু নয় দিনই চাই ? যা আমরা নয় দিন করতে পারি, তা জীবনভরও করতে পারবো। এটা মনে রাখতে হবে যে বাধ্যবাধকতায় আত্মার শক্তি বাড়বে না। প্রতিজ্ঞা ও দৃঢতার সাথে করতে হবে। নব রাত্রির এই নয় দিন মাটির প্রদ্বীপ জ্বালানো হয় ও খেয়াল রাখা হয় যাতে প্রদ্বীপ এই নয় দিনের মধ্যে নিভে না যায়। মাটির প্রদ্বীপ শরীরের প্রতীক আর শিখা হলো আত্মার প্রতীক। অর্থাৎ, এই নয় দিন আত্মা soul conscious স্থিতিতে emerge থাকে

আর চার দিকে তার প্রকাশ ফেলায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকলে জীবন শুভ হয়। আত্মা, চাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে shift হয়ে যায় আর প্রদান বা দেওয়ার দিকে এগোয় -ভালোবাসা প্রদান, সম্মান প্রদান, সহযোগ প্রদান যা সবাইকে প্রদান করা ও সব সময়ের জন্য প্রদান করা । এমন প্রদীপ জ্বলতে থাকলে জীবন শুভ থাকবে। এই সব কিছু হয়েগেলে সম্পর্ক খুব ভালো হয়ে যায়। কাউকে সহযোগ দেওয়া, কারুর সাথে adjust করা, স্বাভাবিক জীবন জাপনের পদ্ধতি হয়ে যায়। সম্পর্কে adjustment, আর এর থেকে যে harmony তৈরী হয়, তার স্মরণিকা হলো রাস খেলা। কত সুন্দর নৃত্য কলা যাতে এক এক জনের হাতে দুটো করে ছোট ছোট ছড়ি (stick) থাকে ও একজন অন্যজনের ছড়ি দেখে ছড়ি মারে। সেটা সুন্দর একটা নৃত্যে পরিণত হয়। আর যদি নিজের ইচ্ছা মতো ছড়ি মারতে থাকে তাহলে সেটা যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হবে। যাদের সাথে আমরা থাকি, কর্ম করি, ওদের স্বভাব /সংস্কার কে দেখে, নিজের স্বভাব /সংস্কার কে ব্যবহার করলে সংস্কারের রাস (মিলন) হতে থাকবে। তার জায়গায় শুধু নিজের সংস্কারের ছড়ি মারতে থাকলে, ঘরও যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়ে যায় । পরমাত্মা বলেন, যে আত্মা নিজের জাগরণ করে নিজের বিকার থেকে, ব্রত নেয় জীবনে, তার জীবনে স্বাত্ত্বিকতা আসে, soul conscious তার জীবনে স্বাভাবিক হয়ে যায়, সে অন্যের স্বভাব /সংস্কারের সাথে রাস (মিলন) করে। আসুন আমরা আমাদের মধ্যে অষ্ট শক্তির আহ্বান করি। নিজের দুর্বলতারুপি অসুরগুলোর বিনাশ করি 'সহজ রাজযোগ' meditative lifestyle এর সাহায্যে। সবাইকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা ।

হেঁশেল থেকে

দই ভিন্ডি

উপকরণ: ঢেঁড়শ ২৫০gm, পেয়াঁজ কুচি ২টি, আদা বাটা ১/২ চা চামচ, রসুন বাটা ১/২ চা চামচ, জিরে পাউডার ১/২ চা চামচ, চাট মসলা ১ চা চামচ, লাল লঙ্কা পাউডার ১/২ চা চামচ, হলুদ পাউডার ১/২ চা চামচ, নুন স্বাদ অনুযায়ী, তেল পরিমান মতো, দই ১ কাপ, টমেটো কুচি ১টি, চিনি ১ চা চামচ।

প্রণালী: ভিন্ডি আকারে ছোট ও এক মাপের হওয়া চাই। ভিন্ডি ধুয়ে মাথা ও পেছনটা একটু কেটে, লঙ্কা চেরার মতো করে চিরে নিতে হবে। হলুদ ও নুন মাখিয়ে ১৫ মিনিট ঢেকে রাখতে হবে। কড়াইতে তেল গরম করে ভিন্ডি ভেজে তুলে নিতে হবে। আবার তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচোনো লালচে এবং মুচমুচে করে ভেজে আলাদা রাখতে হবে। সাদা জিরে গোটা গরম তেলে ফোড়ন দিয়ে দিতে হবে। কিছুটা পেঁয়াজ কুচি তেলে ছাড়তে হবে। এক মিনিট পর আদা ও রসুন বাটা, জিরে পাউডার, হলুদ, লঙ্কা পাউডার, চ্যাট মসলা ও নুন দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। মসলা ও তেল আলাদা হলে ভিন্ডি ভাজা ঢেলে আল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। ভিন্ডি গুলো এইবার নামিয়ে নিতে হবে। দই ফেটিয়ে নুন ও চিনি মেশাতে হবে। দই টুকু ভিন্ডির উপর ঢেলে দিয়ে উপরে মুচমুচে পেঁয়াজ ভাজা ছড়িয়ে দিতে হবে।

মাটন গোয়ালন্দি স্টিমার কারি

উপকরণ : মাটন ৬০০gm (৫০gm করে ১২ টুকরো), আলু ২টি, আদা-রসুন বাটা ৬০gm, পেঁয়াজ বাটা ৮০gm, তেজ পাটা ২টি, গোটা গরম মসলা (ফোরণের জন্য) আন্দাজ মতো, তেল ১০০gm, সাদা জিরে বাটা ৮০gm, রাঁধুনি ২ চামচ, নুন স্বাদ মতো, চিনি ১চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১/৪ চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ৩ চামচ, গোটা মরিচ (লঙ্কা) ১ ১/২ কাপ, গোটা গোল মরিচ ১/২ চামচ, পুদিনা-ধনেপাতা বাটা ১ চামচ।

প্রণালী: কড়াইতে তেল গরম হলে তেজপাতা গোটা গরম মসলা ফোড়ন দিতে হবে। এবার পিঁয়াজ বাটা দিয়ে নাড়তে হবে যতক্ষণ না সোনালী রং ধরে। এবার আদা রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে হবে। এরপর মাংসের টুকরো গুলো দিতে হবে। আঁচ কমিয়ে নিতে হবে। পুদিনা, ধনেপাতা বাটা, গোটা গোলমরিচ আর কাঁচা লঙ্কা দিতে হবে। ১০ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। ফেটানো দই, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন, চিনি, রাঁধুনি ও সবশেষে জিরে বাটা দিতে হবে। এবার আলু ডুমো ডুমো করে কেটে মাংসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষন কষে নিয়ে জল দিয়ে ৩৫ মিনিট স্টিম করে নিতে হবে। তৈরী হলে গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করতে হবে।

মৌসুমি বিশ্বাস

intersoft 25
Think IT Simple

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা

Wish IBCAJ Members & Guests A Happy & Safe Durga Puja 2023

25+ Years

250+ Clients

300+ EMPLOEES

20+ Nationalities

Join Us @ Japan

- Tokyo
- Osaka
- Kobe
- Fukuoka
- Sapporo

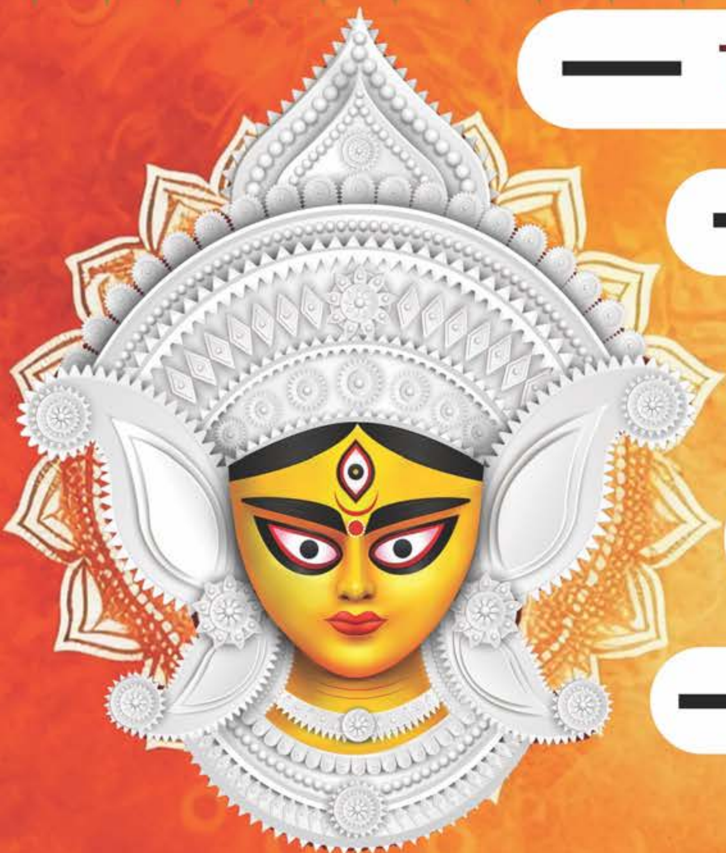

We Help You Grow & Reach Goals!

- Desktop Engineers L1/L2/L3
- Python/Java Engineer
- Server/Network Engineer
- Embedded & Bilingual SE
- Data Center Engineer
- PM/PMO/SDM

Mail Us
resource.delivery@intersoftkk.com

Website
Intersoftkk.com

Call Us
03.6670.6899

Events of IBCAJ 2022-2023

Durga Puja, 2022

Independence Day, 2022

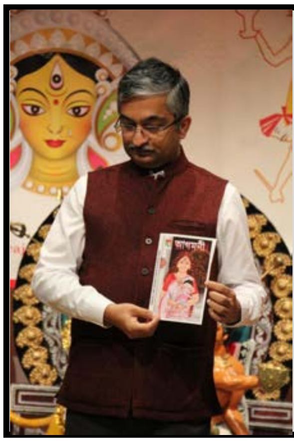

Publication of Agomoni, 2022

Ladies Year End Party, 2022

Saraswati Puja, 2023

Winter Picnic, 2022

Bengali New Year, 2023

Basanta Utsav, 2023

Rabindrajayanti, 2023

Summer Picnic, 2023

New Durga Idol, 2023

Events of IBCAJ
2022-2023

Current members of IBCAJ, 2023

Core Committee for the year 2023-24

Mr. Swapan Kumar Biswas	President
Mr. Naba Kumar Ghosh	Advisor to the President
Dr. Sukanya Mishra	Joint Secretary
Mr. Subhasis Pramanik	Joint Secretary
Mr. Pallab Sarkar	Media Coordinator
Mr. Sugam Ghosh	Finance Coordinator
Mr. Mrinmoy Das	Cultural Coordinator
Mr. Bhaskar Dasgupta	Magazine Coordinator
Mr. Subhabrata Mukherjee	Event Coordinator
Mr. Soumya Dutta	Member of the Core Committee
Ms. Ruma Mandal	Member of the Core Committee

IBCAJ members List

1	Ms. Sumana Chakraborty
2	Mr. Amit Chakraborty
3	Ms. Ankita Nandy
4	Mr. Amit Prakash Dutta
5	Ms. Oindrila Debnath
6	Mr. Amlan Debnath
7	Ms. Anindita Datta
8	Mr. Kalaswan Datta
9	Ms. Mousumi Nandy
10	Mr. Anirban Nandy
11	Ms. Antra Sen
12	Mr. Sovan Sen
13	Ms. Ruma Mandal
14	Mr. Arghya Dutta
15	Ms. Aritrika Lahiri
16	Dr. Nabarun Roy
17	Mr. Arpan Kumar Das
18	Ms. Tanaya Mukherjee Dasgupta
19	Mr. Bhaskar Dasgupta
20	Ms. Nandita Deb
21	Mr. Bhaskar Deb
22	Ms. Bidisha Banerjee
23	Mr. Pallab Sarkar
24	Ms. Bipasha Dutta
25	Mr. Soumya Dutta
26	Ms. Deepanwita Ghosh
27	Mr. Biplab Chakraborty
28	Ms. Jayeesha Ghosh

IBCAJ members List

29	Ms. Munmun Biswas	45	Dr. Sukanya Mishra	61	Ms. Simpi Guha
30	Mr. Dipankar Biswas	46	Dr. Nitin Srivastava	62	Mr. Sudipta Das
31	Dr. Kaustav Bhattacharya	47	Ms. Poulami Ghosh	63	Ms. Tanaya Ganguly Mukherjee
32	Ms. Rekha Bafna	48	Mr. Sugam Ghosh	64	Mr. Soumyadeep Mukherjee
33	Ms. Moumita Mukherjee	49	Dr. Pradipta Mukherjee	65	Ms. Tamasa Kundu
34	Mr. Subhabrata Mukherjee	50	Ms. Somdatta Banerjee	66	Mr. Srinesh Kundu
35	Ms. Moumita Roy Chowdhury	51	Mr. Praveen Solanki	67	Ms. Subarna Maity
36	Mr. Suvankar Roy	52	Ms. Paromita Roy	68	Mr. Subhasis Pramanik
37	Ms. Moupia Mukherjee	53	Mr. Punit Tyagi	69	Dr. Suchandra Banerjee
38	Mr. Sanjib Chatterjee	54	Dr. Rajib Shaw	70	Ms. Sudipta Nundy Datta
39	Ms. Mousumi Biswas	55	Ms. Subhashree Chatterjee	71	Mr. Supriyo Kumar Datta
40	Mr. Swapan Kumar Biswas	56	Dr. Ranit Chatterjee		
41	Ms. Sagarika Dey	57	Ms. Ridhima Gurung		
42	Mr. Mrinmoy Das	58	Mr. Suchhando Chatterjee		
43	Ms. Poonam Ghosh	59	Ms Srijita Sanyal Sur		
44	Mr. Naba Kumar Ghosh	60	Mr. Sanjib Sanyal		

IBCA JAPAN

আগমনী 2023

Website: https://ibcaj.org
Email: info@ibcaj.org
Facebook: https://facebook.com/ibcaj

Publisher: India (Bengal) Cultural Association Japan